মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-১১

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

ডিসেম্বর ২০১৪ ইং, সফর ১৪৩৬ হি., অগ্রহায়ন ১৪২১ বাং

صفر المظفر ١٤٣٦ دسمبر ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৫
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত : ৬
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
নারী-পুরুষের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস..... ৯
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
অলিমা কখন ও কিভাবে..... ১৫
মুফতী শরীফুল আজম
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১১..... ২০
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
মৃত্যুর পর লাশ দাফনে বিলম্ব : ইসলাম কী বলে?..... ২৪
মুফতী মুহাম্মদ শফিক
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৮..... ২৯
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৭..... ৩৫
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৩
মলফূজাতে আকাবের ৪৬
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

'রাজনীতি' বলেই কথা!!!

শব্দকোষে বহু অর্থে ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে 'রাজনীতি' শব্দটি সর্বশীর্ষেই হবে হয়তো। এই শব্দটির কয়টি অর্থ আছে বাস্তবতার আলোকে তা গুনে-পড়ে শেষ করার মতো নয়। দেশ হিসেবে একেক দেশে শব্দটির বাস্তব অর্থ একেক রকম। মানুষ হিসেবে দেখা হলে প্রত্যেক মানুষের মাঝেই রাজনীতির অর্থটা আলাদা মনে হবে। হয়তো সে কারণেই অনেক বিষয়, যেগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রে অবৈধ-ঘৃণিত সেগুলো রাজনীতির ফাঁকফোকরে বৈধ হয়ে যায়।

জায়গা-জমি নিয়ে দাঙ্গা। সেখানে কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটল। দেখা যাবে এলাকাশুদ্ধ গ্রেফতার। বিচারের আওতায় আসবে দোষী-অদোষী অনেকে। মোটামুটি একটা বিচারপ্রক্রিয়া চলবে। কিন্তু রাজনৈতিক দাঙ্গা বেশি হওয়ায় বিচারপ্রক্রিয়ায় অনেকটা ধীরগতি বা উদাসীনতা লক্ষ করা যায় সব খানে। দুনিয়ায় রাজনীতির নামে কত খুন-খারাবি, গুম, হত্যা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বিচার কয়টি হয়েছে–তাও নিশ্চয়ই অজানা বিষয় নয়।

শিক্ষার সাথে অস্ত্রের কী সম্পর্ক! কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম দেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির নামে অস্ত্রের চর্চা আছে, যা স্বাভাবিক জীবনে অনেক ঘৃণিত। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে মহত্ত্বের পরিচায়ক। চুরি-ডাকাতি, তথা অন্যায়ভাবে মানুষের হক মেরে খাওয়া, সম্পদ নষ্ট করা, হামলা-ভাংচুর ইত্যাদি অবৈধ এবং অতীব ঘৃণিত বিষয়। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে দুর্নীতি, সম্পদ নষ্ট, গাড়ি ভাংচুর ইত্যাদি যেন প্রশংসনীয়। এসব কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। কিন্তু বিভিন্ন দেশে রাজনীতির নামে আরো কত কী হয় তার পরিসংখ্যান মুশকিল।

এই লেখার বিষয়বস্তু এগুলো নয়। বিষয় আরেকটি। উল্লিখিত ঘৃণিত বিষয়গুলো চর্চা হয়েছে, হচ্ছে। মানুষ এসব তাদের চূড়ান্ত ভাগ্য মনে করে বা অসহায়ত্ববশত মেনেও নিচ্ছেন।

সম্প্রতি আরেকটি মর্মান্তিক বিষয় লক্ষ করা যাচ্ছে, তা হলো ধর্মীয় অনুভূতিতে কেউ আঘাত করলে সেটিকেও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা। এটি কিন্তু যেনতেন বিষয় নয়। দুনিয়ার ইতিহাসে এর নজির খুবই কম। রাজনীতির কারণে গুম, হত্যা, প্রতারণা ইত্যাদির ইতিহাস পাওয়া গেলেও ধমের অবমাননাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার ইতিহাস সম্ভবত কমই পাওয়া যাবে। কিছু কিছু অমুসলিম রাষ্ট্র হয়তো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে মিডিয়ায় প্রচার করেছে। মুসলমানদের প্রতিবাদের মুখে অবমাননাকারীকে গ্রেফতার করে বিচারের নামে প্রতারণারও অবতারণা করেছে। এগুলো নিকট অতীতেরই ঘটনাপ্রবাহ।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের এক লোক দেশের বাইরে বসে ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিধান হজ নিয়ে চরমভাবে কটাক্ষ করেছে। এই চরম ধৃষ্টতার কারণে পুরো মুসলিম উম্মাহের অন্তর জর্জরিত হয়েছে। উলামায়ে কেরাম মুসলমানদের সাথে নিয়ে এই ধৃষ্টতার কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছে। এমনকি সরকার ও বিরোধী দল সকলে এর প্রতিবাদ জানিয়ে মুসলমানদের অন্তরে শান্তনা দিতে চেষ্টা করেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তার বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারি করা হয়।

ইসলাম নিয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী এই লোক দেশে ফিরলে মুসলমানগণ ক্ষোভ এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের পর আদালত তাকে জেলে প্রেরণ করেন।

কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়ার ভাষ্য থেকে যা ভেসে আসছে, তা কোনোমতেই দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর বিষয় নয়। সম্প্রতি বিভিন্ন মিডিয়ার খবর থেকে জানা যায়, ধর্ম অবমাননা বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ পরস্পরকে দূষছে। কেউ বলছে এসব নাটক, কেউ বলছে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে এগুলো করা হচ্ছে।

এসব কিসের আলামত? দূরভিক্ষণে প্রতীয়মান হবে ধর্ম অবমাননাকে রাজনৈতিক স্বার্থের অংশ বানানোর চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে ধর্ম অবমাননার একটি ধারা সৃষ্টি হচ্ছে, যা দীর্ঘ ফিতনা-ফ্যাসাদেরই আলামত বহন করে।

ইসলামের চাহিদা হলো, ধর্ম অবমাননার বিষয়কে দীর্ঘায়িত হতে না দেওয়া। দুষ্কৃতিকারীদের বিচার তৎক্ষণাৎ শেষ করা। এমনকি এসব বিষয় ব্যাপকভাবে প্রচার না করা। এর কারণসমূহে এও থাকতে পারে যে, যেন এর মাধ্যমে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয় এবং এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনের দুঃসাহসিকতা হ্রাস পায়।

বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, এ পর্যন্ত যেসব অমানবিক বিষয়কে রাজনৈতিক স্বার্থের অংশ বানানো হয়েছে, সেগুলোর জন্য গণমানুষকে অগণিত খেসারত দিতে হচ্ছে। দীর্ঘ খেসারতের ধারাবাহিকতা খতম হচ্ছে না। গুম ও হত্যার ট্রেন থামছে না। অন্যায়-দুর্নীতির অমানবিকতা মানবতাকে তার সুসংহত গন্তব্য থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি ধর্ম অবমাননার মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে রাজনৈতিক স্বার্থের অংশ বানানো হয়, নতুন প্রজন্মের সামনে এটিকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পন্থা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তবে এর পার্থিব এবং পারলৌকিক খেসারত দিতে গিয়ে দেশ ও জাতির ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

তাই আমাদের আশা, রাজনৈতিক কর্ণধারগণ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন। রাজনীতির অমানবিক দিকগুলো প্রশস্ত না করে সঙ্কোচনের চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম অবমাননার মতো স্পর্শকাতর বিষয় যাতে দীর্ঘায়িত না হয়, সে ব্যাপারে সঠিক ও সুস্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সচেষ্ট হবেন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৮/১১/২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ(٩١)

(পক্ষান্তরে) যারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, তারপর কুফরীতে অগ্রগামী হতে থেকেছে, তাদের তাওবা কিছুতেই কবুল হবে না। এরূপ লোক (সঠিক) পথ থেকে বিলকুল বিচ্যুত হয়েছে।

যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের কারও থেকে পৃথিবীভরতি সোনাও গৃহীত হবে না- যদিও তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা দিতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না। (আলে ইমরান ৯০-৯১)

বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসকারী এবং ওই অবিশ্বাসের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণকারীদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেছেন। বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় তাদের তাওবা গৃহীত হবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

وليست التوبة للذين يعملون السيأت حتى اذا حضر احدهم الموت

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তি মৃত্যু দেখে তাওবা করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। (৪:১৮)

এখানে ওই কথাই বলা হয়েছে যে, তাদের তাওবা কখনই গৃহীত হবে না এবং এরাই তারা, যারা সুপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কতক লোক মুসলমান হয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে। তারপর তারা স্বীয় গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, এখন তাদের তাওবা গৃহীত হবে কি না? তাদের গোত্রের লোক তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করে। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-বাযযার)

এরপর বলা হচ্ছে, কুফরের ওপর মৃত্যুবরণকারীদের তাওবা কখনও গৃহীত হবে না, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে খরচ করে। নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআন একজন বড় অতিথি সেবক ও গোলাম আযাদকারী লোক ছিল। তার এ পুণ্য কোনো কাজে আসবে কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, না কেননা সে সারা জীবনে একবারও رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! কিয়ামতের দিন আমাকে ক্ষমা করুন' বলেনি। তার দান যেমন গৃহীত হবে না, তেমনই তার বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না। যেমন অন্য জায়গায় এসেছে–

لايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة

অর্থাৎ 'না তাদের বিনিময় গৃহীত হবে, না সুপারিশ কোনো উপকার দেবে।' (২:১২৩) আরেক জায়গায় এসেছে- لابيع فيه ولا خلال 'সেই দিন না থাকবে ক্রয়-বিক্রয়, না থাকবে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা। অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে : পৃথিবী পরিমাণ জিনিস যদি কাফিরদের নিকট থাকে এবং আরও এ পরিমাণ জিনিস হয়, অতঃপর সে ওই সমস্তই কিয়ামতের শাস্তির বিনিময়ে মুক্তিপণরূপে প্রদান করে তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। তাকে সেই কষ্ট-যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। ওই বিষয়ই এখানেও বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ ولو افتدى শব্দের واو টিকে অতিরিক্ত বলেছেন। কিন্তু واو টিকে সংযোগের واو স্বীকার করত আমরা যে তাফসীর করেছি, ওই তাফসীর করা খুব উত্তম। সুতরাং প্রমাণিত হলো, কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে কোনো জিনিসই রক্ষা করতে পারবে না। যদিও সে অত্যন্ত সৎ ও খুবই দানশীল হয়। যদিও সে পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, কিংবা পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি এবং সিক্ত মাটি পরিমাণ স্বর্ণ শাস্তির বিনিময়ে খরচ করে দেয় তবুও তা তার কোনো উপকারে আসবে না।

মুসনাদে অহমদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, জাহান্নামবাসীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, পৃথিবীতে যত কিছু রয়েছে সবই যদি তোমার হয়ে যায় তবে কি তুমি এ দিনের ভীষণ শাস্তির বিনিময়ে ওই সমস্তই মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে দেবে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার নিকট এর তুলনায় অনেক কম চেয়েছিলাম। যখন তুমি তোমার পিতা আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। তুমি আমার সাথে কাউকেও অংশীদার করবে না। কিন্তু তুমি শিরক ছাড়া থাকতে পারোনি। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও অন্য সনদে রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

দ্বিমুখীপনার নিষিদ্ধতা

অনেক মানুষের এ অভ্যাস থাকে যে, যখন দুই ব্যক্তি অথবা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও বিবাদ দেখা দেয়, তখন সে উভয় পক্ষের সাথে মিলে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে। তেমনিভাবে অনেকের অবস্থা এই হয় যে, যখন কারো সাথে মিলিত হয়, তখন তার সাথে নিজের সুন্দর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু পশ্চাতে তার দোষ ও সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলে। এ ধরনের মানুষকে দুমুখা বলা হয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ কর্মনীতি এক ধরনের মুনাফেকী এবং এক প্রকার প্রতারণা। যা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈমানদারদেরকে কঠোর তাকীদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিয়েছেন যে, এটা জঘন্য গুনাহ এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তিরা কঠোরতর আযাবের সম্মুখীন হবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ تجدون شر الناس يوم القيمة ذا الوجهين الذى ياتى هولاء بوجه وهولاء بوجه (روه البخارى ومسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে পাবে, যে এদের কাছে এক মুখ নিয়ে যায়, আবার ওদের কাছে আরেক মুখ নিয়ে হাজির হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অবস্থায় দেখা যাবে, এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা আরেকটি হাদীসে এসেছে–

عن عمار قال قال رسول الله ﷺ من كان ذا وجهين فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار (رواه ابوداود)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দুমুখী হবে, কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দুটি জিহ্বা থাকবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : সৎকর্ম এবং সৎস্বভাবসমূহ, যেগুলোর ওপর আখেরাতে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, এগুলো বিভিন্ন প্রকারের এবং এগুলোর স্তরও ভিন্ন ভিন্ন। অনুরূপভাবে মন্দকর্ম এবং মন্দ স্বভাবসমূহ- যেগুলোর ওপর আখেরাতের শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন স্তরের। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা প্রত্যেক ভালো ও মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নির্ধারণ করেছেন। তাই মানুষের মুখে সেখানে আগুনের দুটি জিহ্বা থাকবে। মনে রাখা চাই যে, কোনো কোনো সাপের দুটি জিহ্বা থাকে।

এখানে এ কথাটি আমাদের সবার জন্য ভাবনার বিষয় যে, কোনো কোনো মন্দ কর্ম ও মন্দ স্বভাব বাস্তবে খুবই ভয়াবহ এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু আমরা এগুলোকে সাধারণ ব্যাপার মনে করি এবং এগুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, আমরা ততটুকু যত্নবান হই না। এ ধরনের মন্দ বিষয়সমূহ সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, তোমরা এটাকে সাধারণ ব্যাপার এবং হালকা বিষয় মনে করো, অথচ আল্লাহর নিকট এটা খুবই গুরুতর ও মারাত্মক বিষয়। এ দ্বিমুখীপনাও এ পর্যায়ের। আমাদের মধ্যে অনেকেই এটাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে এবং এটা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করে না। অথচ এ দুটি হাদীস দ্বারা জানা গেছে যে, এটা কত গুরুতর ও মারাত্মক গুনাহ এবং আখেরাতে এর জন্য কী কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তবে দুটি বিবদমান পক্ষের সম্ভাব্য ফিতনা দমানোর জন্য যদি কেউ উভয় পক্ষের হয়ে নিজ থেকে কিছু বলে এমনকি অবাস্তব কিছু বলে দেয় তা দোষণীয় নয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

عن ام كلثوم قال قال رسول الله ﷺ ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمى خرا (رواه البخارى ومسلم)

হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবী মুআইত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি কায়েম করতে গিয়ে (এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে) ভালো কিছু বলে এবং সদ্ভাব সৃষ্টি হয়, এমন কথা আদান-প্রদান করে। (বুখারী মুসলিম)

অনেক সময় দুই ব্যক্তি অথবা দুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ বিবাদ ও ক্ষোভ দেখা দেয়। প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে নিজের শত্রু মনে করে এবং এর ফলে বিরাট বিরাট ফিতনা সৃষ্টি হয়। এমনকি খুন-খারাবি এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটে যায় এবং শত্রুতার উত্তেজনায় উভয় পক্ষ থেকেই জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে নিজের অধিকার ও হক মনে করা হয়। এই পরিস্থিতিতে যদি কোনো কল্যাণকামী ও নিঃস্বার্থ বান্দা বিবদমান দুইপক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির প্রয়াসী হয় এবং এ প্রয়োজন অনুভব করে যে, এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের নিকট এমন হিত কামনামূলক কিছু কথাবার্তা পৌঁছানো দরকার, যার দ্বারা বিবাদ ও শত্রুতার আগুন নিভে যায় এবং সমঝোতা ও সুধারণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহলে সে এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে এ ধরনের কথা নিজে বানিয়ে বললেও এটা ওই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা অন্যায় কবীরা গুনাহ। আবার এটিকে দ্বিমুখীনীতিও বলা যাবে না।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

মসজিদকে আবাদ করা :

মসজিদে তিন মিনিটের জন্য হলেও পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পরিবেশ গড়ে তোলা এবং নামাযের পর কিতাব হতে কিছু পড়ার নিয়ম করা উচিত। যিনি কুরআন পড়তে পারেন না তিনিও কুরআন শরীফ খুলে বসবেন। কুরআনের পৃষ্ঠায় হাত বোলাবে। বলবে এটিও হক এটিও হক। তিন মিনিটে কমপক্ষে পাঁচ হাজার নেকী পাওয়া যাবে। এক পৃষ্ঠা কুরআন তিলাওয়াতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার নেকী পাওয়া যায়। আধা পৃষ্ঠা পাঠ করলে আড়াই হাজার নেকী পাওয়া যাবে।

তালিবে ইলম হয়ে 'মসবূক' কেন হবে?

তালেবে ইলম হয়ে মসবুক হওয়া এটি কেমন কথা! কোনো কোনো সময় অপারগতার কারণে মসবূক হতে হয় সেটা ভিন্ন কথা। তাকবীরে উলার গুরুত্ব দিতে হবে। এটিই আমলের বয়স। এই বয়সেই গুরুত্বসহকারে আমল করে নিতে হবে। গুজরাটের মন্ত্রী আসিফ খানের জীবনীতে আছে, মন্ত্রণালয়ের অসংখ্য ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কোনো সময় তাকবীর উলা ছাড়তেন না। আজ সারা দুনিয়ায় হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর ফয়জ বিস্তৃত রয়েছে। তাঁর সাথে সম্পর্ককারী মুরিদান খলীফা এবং তাঁর শায়খদের ফয়জও সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত। মিয়াজী খুব বড় আলেম ছিলেন না। অথচ তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব কী ছিল? চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার তাকবীরে উলা ছোটেনি। সে কারণে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর মুরশিদ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন তখন তিনি তাঁর বাইআত রুজু করার জন্য শায়খ খুঁজছিলেন। এমতাবস্থায় স্বপ্নযোগে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ হয়। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে মিয়াজির দিকে ইশারা করেন। কত বড় ভাগ্য। তাকবীরে উলা এবং প্রথম কাতারে নামায আদায়ের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা চাই। আমাদের এখানে নিয়ম করা হয়েছে, যারা অলসতার কারণে তাকবীরে উলা পায় না, জামাআতে গাফলতী দেখা যায় তাদের জন্য প্রথম কাতারে স্থান নির্ধারিত করা হয়। বলা হয়, ওই ওই ছাত্র প্রথম কাতারে এই স্থানে নামায পড়বে। যদি না আসে তাদের জায়গা খালি পড়ে থাকে। তখন তারা তাড়াহুড়া করে ওই জায়গায় পৌঁছে যায়। এভাবে ছাত্রদের অলসতা দূর করার চেষ্টা করা হয়। এর মাধ্যমে উক্ত ছাত্রদের মধ্যে একটি ফিকির পয়দা হয় এবং তাদের অলসতা দূর হয়ে যায়।

মর্যাদার মাপকাঠি :

হযরত ওয়ালা (রহ.) একদা চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। অন্যান্যরা বসেছিলেন নিচে। তখন হযরত বললেন, উপরে বসা কোনো মর্যাদার বিষয় নয়। নিচে বসাও অমর্যাদার বিষয় নয়। অনেক সময় এর উল্টোটাও হয়ে থাকে। দাঁড়িপাল্লার যেটা খালি থাকে সেটা উপরেই উঠে থাকে। কেউ উপরে বসল, সেটা কিন্তু মানুষের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি নয়। মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো তার আমল ও চরিত্র। যার আমল-আখলাক ভালো সে মানুষের অন্তরে মাহবুব ও সম্মানী হয়। সে মাটি পাটিতে বসুক বা চেয়ারে বসুক। যদি আমল ভালো না হয় সে উপরে বসলেও তার কোনো মর্যাদা নেই। যেমন কোনো লোক তার পুরো শরীরে খোশবু লাগিয়েছে, আবার কেউ শুধু কাপড়ে খোশবু লাগিয়েছে। এর মধ্যে অবশ্যই ব্যতিক্রম হবে। যে লোক ভালো ও নেক আমল করে সে হলো ওই লোকের ন্যায় যে সারা শরীরে খোশবু লাগিয়েছে। তার শরীর থেকে খোশবুই বের হবে। সে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করবে।

রিযিকের অসম্মানী করা অভাব-অনটনের কারণ :

গুনাহ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক কমে যায়। অনেকে পাত্রে কিছু তরকারি বা ডাল থাকলে সেগুলো ধুয়ে ফেলে। এটি অত্যন্ত ভুল। রিযিক হ্রাস পাওয়ার কারণ হয়ে থাকে। বাসন ভালো মতে পরিষ্কার করে খাওয়া উচিত। সেরূপ আঙুল চেটে খাওয়া উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে

كان رسول الله ﷺ يلعق يده قبل ان يمسحها (رواه مسلم)

রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আঙুল মোছার আগে চেটে খেতেন।

এটি হলো রিযিকের সম্মান এবং মূল্যায়ন করা।

আসল তাবলীগ কী?

আসল তাবলীগ হলো উত্তম কাজ করা, খারাপ কাজ পরিহার করা। ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং নিজেও ভালো কাজ করা, অন্যকে ভালো কাজের প্রতি আকৃষ্ট করা। খারাপ কাজ থেকে নিজেও বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন পরিসরে প্রদত্ত হযরতের বয়ান থেকে সংগৃহীত

দুনিয়াপ্রীতি ও উলামায়ে কেরামের করণীয়

চলমান সময়ে অনৈসলামিক পশ্চিমা সভ্যতা বিশ্বজুড়ে ঝেঁকে বসেছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও এসব সভ্যতাকে আলিঙ্গন করে যাচ্ছে আগ্রহ ভরে। কিন্তু ইসলাম তো কখনোই এ কথার অনুমতি দেয়নি যে জীবনের তরীকে সময়ের এই স্রোতে ভাসিয়ে দেবে, স্রোত যেদিকে চায়, সেদিকে নিয়ে যাবে। কারণ ইসলামের মূল শিক্ষা হলো, প্রত্যেক যুগে বিজয়ী বেশে থাকা এবং এমন তদবীর বাতলে দেয়া, যার দ্বারা সর্বকালে ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সংস্কার ও মহা বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

তিনিই নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের ওপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষ্যদানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (আল-ফাতাহ ২৮)

রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

الاسلام يعلو ولا يعلى

অর্থাৎ, ইসলাম শির উঁচু করে থাকে, নিচু করে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون

আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফেরদের জন্য, যতই অপ্রীতিকর হোক। (আসসাফ ৮)

আরো ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين

যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপণীত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন। (আনকাবুত ৬৯)

এ ছাড়া অসংখ্য আয়াত ও হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, ইসলাম ধর্মকে বিশ্বব্যাপী সংস্কারের জন্যই মনোনীত করা হয়েছে।

ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দ্বীন কেবল ইসলাম। (আলে ইমরান ১৯) যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আলে ইমরান ৮৫)

আলেম সমাজের কাছে চাওয়া :

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ উম্মতের সর্বোত্তম পদধারী উলামায়ে কেরামের কাছে দাবী করে যে, আল্লাহ তা'আলা এবং মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সিদ্ধান্তের ওপর নিজেদের বিশ্বাস ও আকীদার প্রতিফলন ঘটানোর। পশ্চিমা তাহযীব তামাদ্দুনের দুর্বার গতিতে ধেয়ে আসা স্রোত থেকে উম্মতে মুসলিমাকে বাঁচানোর এবং পাকপবিত্র রাখার বন্দোবস্ত করা। আলেম হিসেবে আপনিই তো চলমান সময়ের কায়েদ। সবার আগে আল্লাহর কাছে আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে। ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা আপনার জন্যই বরাদ্দ। প্রথমেই আপনাকে এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হবে নামধারী মুসলিমরা যখন তোমাদের উপস্থিতিতে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের শিকড় গেড়ে বসছিল, তখন তোমরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী কী করেছিলে? এর উত্তরে কোনো ধরনের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

দেখুন, এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, যুগের স্রোতে কোনো দুনিয়াদার ভেসে যাবে। কারণ তারা তো দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকীফ নয়। কিন্তু আক্ষেপ হয়, উলামায়ে দ্বীনের ওপর যারা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট দুনিয়া অপছন্দনীয় এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো জানা সত্ত্বেও দুনিয়ামুখী? অথচ অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে দুনিয়ার মহব্বত এবং দুনিয়ামুখী হওয়া থেকে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। কোথাও পুরো দুনিয়াকে متاع قليل বলে এর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে।

যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى

অর্থাৎ, পার্থিব উপায়-উপকরণ যৎসামান্য আর আখিরাত হলো উত্তম প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্য।

কোথাও দুনিয়াকে ক্রীড়া-কৌতুকর উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ করেন–

انما الدنيا لهو ولعب

অর্থাৎ, দুনিয়া খেল-তামাশার নাম।

কোথাও ধোঁকা বলে আখ্যায়িত

করেছে।"

وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور

অর্থাৎ, আরো (জান্নাতের বিপরীতে) এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (আলে ইমরান ১৮৫)

কোথাও দুর্যোগে কবলিত ফসলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ, পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো কিছুটা এ রকম, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, যদ্দরুণ ভূমিজ সেই সব উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে জন্মাল, যা মানুষ ও গবাদি পশু খেয়ে থাকে। অবশেষে ভূমি যখন নিজ শোভা ধারণ করে ও সেজেগুজে নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকগণ মনে করে এখন তা সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন, তখন কোনো একদিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে (যে তার ওপর কোনো দুর্যোগ আপতিত হোক) এবং আমি তাকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। যে সকল লোক বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায় তাদের জন্য এভাবেই নিদর্শনাবলি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করি। (সূরা ইউনুস-২৪)

কখনো এর বাহ্যিক অবয়বকে প্রবৃত্তির পূজারিদের প্রিয় বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইরশাদ করেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٥)

অর্থাৎ, মানুষের জন্য ওই সকল বস্তুর আসক্তিকে মনোরম করা হয়েছে, যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক হয় অর্থাৎ নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রুপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, চতুষ্পদজন্তু ও ক্ষেতখামার। (কিন্তু) স্থায়ী পরিণামের সৌন্দর্য কেবল আল্লাহরই কাছে। (সূরা আলে ইমরান ১৪-১৫)

কোথাও দুনিয়ার মজায় নিমজ্জিতদেরকে মূর্খ ও আহম্মক হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছে। ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨)

অর্থাৎ, যারা (আখিরাতে) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে উদাসীন– নিজের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (সূরা ইউনুস ৭-৮)

আরো ইরশাদ করেন–

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ (হে নবী!) তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দাও - তারা খেয়ে নিক, ফুর্তি ওড়াক এবং অসার আশা তাদেরকে উদাসীন করে রাখুক। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (প্রকৃত সত্য কী ছিল)। (সূরা আল হিজর-৩)

কোথাও পুঁজিবাদের ওপর কঠোর শাস্তির ধমকি দিয়েছে।"

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ, যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দাও। (সূরা তাওবা-৩৪)

কখনো অস্বাভাবিক খানাপিনায় মগ্ন ব্যক্তিকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করে পরিণাম জাহান্নাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ইরশাদ করেন–

وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে খায়, সেভাবে খাচ্ছে, তাদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। (সূরা মুহাম্মদ-১২)

আবার কোথাও কোথাও রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হিদায়াত দিয়েছেন, যেন কয়েক দিনের পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন। কারণ এটা আদ্যোপান্ত ফিতনা।

ইরশাদ করেন–

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

অর্থাৎ, তুমি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে মজা লোটার জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রবের রিযিক সর্বাপেক্ষা উত্তম সর্বাধিক স্থায়ী। (সূরা তাহা-১৩১)

দুনিয়ার প্রতি ঘৃণাসংক্রান্ত অসংখ্য আয়াতের মধ্য হতে শুধুমাত্র কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। বহু হাদীসেও দুনিয়াকে অভিশপ্ত এবং মৃত জানোয়ারের সাথে তুলনা করে অন্বেষণকারীকে কুকুর বলা হয়েছে।

সুতরাং এ দু'আ বেশি বেশি পড়ুন–

إللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا

উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব :

আপনারা উলামায়ে ইসলাম! দুনিয়ার সুখ-শান্তির নেশা পরিত্যাগ করে এবং চোখ ধাঁধানো উপকরণের প্রতি চোখ তুলে না তাকিয়ে আখিরাতের সফলতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া জরুরি। কবি খুব সুন্দর বলেছেন–

ہمی گویم و باز ہمی گویم ہمی
کار ایں است غیر ایں ہمہ ہیچ

"এ কথাই বলবো, আবারো এ কথাই বলবো যে, এটাই আসল কাজ! এটা ছাড়া অন্য সব কাজ তুচ্ছ অতি তুচ্ছ!"

আপনার কাজ তা'লীম ও তাবলীগ, যা আলেমে দ্বীন হওয়ার কারণে আল্লাহ এবং রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে আপনার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং দুনিয়ার অন্য সব দায়িত্ব থেকে আপনাকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কবি সুন্দর বলেন–

اندریں راہ مے تراش و مے خراش
یک دمے غافل دمے فارغ مباش

"এ পথেই নিজের ত্যাগ তিতিক্ষা জারি রাখো। এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল এবং ফারেগ হয়ো না।"

এখানে যেসব কথা বলা হচ্ছে ও শোনানো হচ্ছে সব কিছুই আপনাদের জানা। শুধুমাত্র কল্যাণের দিকে তাকিয়ে কিছু কথা বললাম। আপনাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে এ কথা মাথায় রেখে যে, আপনারা রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়ারিশ। তবে সম্বোধনের মূলে তারাই, যারা খিয়ারুল ওলামা। শেরারুল উলামা যারা তারা নয়। কারণ খিয়ারুল উলামারাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশেষ নবীর ওয়ারিশ। উলামায়ে সু' যারা, তারা তো দুনিয়াকে ওয়ারিশী সূত্রে গ্রহণ করেছে। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়ারিশীর মূল্যায়ন না করার কারণে তাদেরকে প্রথম যেই শাস্তি দুনিয়াতেই দেয়া হয়েছে তা হলো, খিয়ারুল উলামার লিস্ট থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা। (সূরা নিসা-১১৫)

উল্লিখিত আয়াতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থেকে কোনো ব্যক্তি আলেম হিসেবে কি বাদ যেতে পারে? বিশেষ করে যেসব আলেম নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদরাসায় কুরআন-হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন। ভালো-মন্দ, হেদায়াত-গোমরাহী তাদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পরও নবী ও রাসূলগণের মিরাছ "ইলম" কে রেখে ফেরাউন-নমরুদের মিরাছ পার্থিব ভোগ-বিলাসকে ইচ্ছাকৃত অবলম্বন করা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সার্বিক বুঝ দান করুন। আমীন

গ্রন্থনা : মুফতী নুর মুহাম্মদ

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

নারী-পুরুষের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

পুরুষদের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস

১. পুরুষরা অলসতাবশত বা কর্মব্যস্ততার অজুহাতে বা গাফিলতির কারণে ঈমান শিক্ষা করে না এবং ফরযে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করে না। অথচ শরীয়ত এটাকে ফরয ঘোষণা করেছে এবং এ ব্যাপারে কোনো হিলা বাহানা গ্রহণযোগ্য নয়। পাঁচটি বিষয় শিক্ষা করা ফরযে আইন। যথা : ঈমান, ইবাদাত, হালাল রিযিক, বান্দার হক ও আত্মশুদ্ধি; বিস্তারিত জানার জন্য "ইসলামী যিন্দেগী" নামক কিতাব দেখুন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৪)

২. নিজের বিবি-বাচ্চাদের দ্বীনি জরুরি তা'লীম দেয়া থেকে উদাসীন থাকে অথচ এটাও তার ওপর ফরয দায়িত্ব। (তারগীব তারহীব, পৃ. ৩০৪৮)

৩. আত্মসমালোচনা না করে অপরের কাজকর্মের সমালোচনায় আনন্দবোধ করে। আর এর দ্বারা যে গীবতের গুনাহ হচ্ছে, সে কথা ভাবতেও চায় না। তেমনিভাবে অন্যের ব্যাপারে কুধারণা করে গুনাহগার হয়। (হুজরাত; ১২, জামে তিরমিযী, হা. ১৯৮৮)

৪. সালামের অভ্যাস উম্মত থেকে বিদায় নিচ্ছে, যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। অন্যদিকে অনেকে তো সালামের উত্তরই দেয় না, আর কেউ দিলেও ঘাড় নেড়ে বা মনে মনে দেয়। অথচ উত্তর শুনিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৮৭৮৭)

৫. স্ত্রী থেকে নিজের হক পাওনা থেকে বেশি আদায় করে; কিন্তু তার ওপর স্ত্রীর যে অধিকার আছে, তা আদায় করতে রাজি না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের ওপর জুলুম করে থাকে। এটা অন্যায়। (সূরা বাকারা : ২২৮)

৬. সাংসারিক কোনো কাজে পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের সাথে পরামর্শ করে না। যার কারণে পারস্পরিক অন্তঃকলহ বেড়ে যায়। স্ত্রী ও বুঝমান সন্তাদের সাথে পরামর্শ করবে, তার পর যেটা ভালো বুঝে আসে, যেটার মধ্যে কল্যাণ মনে হয়, সেটার ফয়সালা দেবে। (সূরা আলে ইমরান; ১৫৯)

৭. নিজের বাবা-মায়ের খেদমত স্ত্রীর ওপর ফরয মনে করে, অথচ বাবা-মার খেদমত ছেলের দায়িত্ব, স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর খেদমত করা এবং সুযোগমতো নিজ পিতা-মাতার খোঁজখবর রাখা। (সূরা বাকারা : ৮৩)

৮. অনেক বোকা পুরুষ বিবাহের পর নিজ বাবা-মা, ভাইবোনকে পর ভাবতে শুরু করে। আর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দেরকে আপন মনে করে। এমনটা করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ বাবা-মা, ভাইবোনের ভালোবাসা স্বার্থহীন হয়ে থাকে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের ভালোবাসা অনেক সময় এমন হয় না। তাই উভয়কুলের আত্মীয়দের তাদের প্রাপ্য হক যথাযথভাবে দেয়া কর্তব্য। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৬)

৯. সন্তান ছেলে হওয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ থাকে, পক্ষান্তরে মেয়ে হলে স্ত্রীকে দোষারোপ করতে থাকে। অথচ ছেলে বা মেয়ে হওয়া আল্লাহর ইচ্ছা, এতে স্ত্রীর কোনো হাত নেই। অন্যদিকে মেয়ে সন্তানের ফযীলত অনেক বেশি, মেয়ে সন্তান লালন-পালন ও দ্বীনি তা'লীমকে বেহেশতের সনদ বলা হয়েছে। (সূরা শূরা-৪৯, সহীহ বুখারী, হা. নং ১৪১৮)

১০. যৌবনের তাড়নায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলে না। ইসলামী জীবনযাপন বার্ধক্যের জন্য গচ্ছিত রাখে। যেমন যুবক অবস্থায় হজ ফরয হলেও তা আদায় করা বার্ধক্যের সময়ের দায়িত্ব মনে করে, অথচ এটা গুনাহের কাজ। তাছাড়া লম্বা হায়াতের গ্যারান্টি কী? উল্লেখ্য, যে বছর হজ ফরয হয় সে বছর হজে যাওয়া ওয়াজিব, দেরি করা গুনাহ। (সূরা ইনফিতার : ৬, ফাতাওয়ায়ে শামী, খ. ৩ পৃ. ৫২০)

১১. অনেক পুরুষ স্ত্রীদের অন্ধভক্ত হয়ে থাকে। কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়া সবক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাকে প্রাধান্য দিয়ে পিতা-মাতা, ভাইবোনদের সাথে মহা ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। এমনটা হওয়া মোটেও কাম্য নয়। বরং সব সময় স্ত্রীর অভিযোগ যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। নচেৎ লোকদের সামনে বেকুব সাব্যস্ত হতে হয়। (সূরায়ে হুজরাত : ৬, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪)

১২. বিয়ের মজলিসে বেশি পরিমাণ মোহরানা নির্ধারণ করা সামাজিক মর্যাদার বিষয় হিসেবে দেখা হয়। অথচ এটা মর্যাদার কোনো বিষয় নয়। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ও কন্যাদের সর্বোচ্চ মোহর ছিল দেড় শত তোলা রুপা বা তার সমমূল্য। তা ছাড়া মোটা অংকের মোহর ধার্যকালে অধিকাংশ লোকের তা পরিশোধ করার নিয়ত থাকে না, যা অনেক বড় গুনাহ। বিয়ের মজলিসে নগদ আদায়কৃত মোহরকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অবশিষ্ট মোহর আদায় করা সাধারণত পুরুষরা জরুরি মনে করে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী প্রথম রাত্রেই কিংবা পরে কোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্তে স্ত্রী থেকে মোহর মাফ করিয়ে নেয়। অথচ পুরুষ হয়ে মেয়েলোকের কাছে পাওনা মুক্তির ভিক্ষা চাওয়া কেমন আত্মমর্যাদাবোধের পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (মাজমাউয্যাওয়ায়েদ, হা. নং ৭৫০৭)

১৩. উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। ন্যায়-অন্যায় যে পথেই পয়সা আসে সেটাই গ্রহণ করে থাকে এবং নিজের উপার্জনের মাধ্যমকেই রিযিকদাতা ভাবে। যে কারণে তা নষ্ট হলে পেরেশানির সীমা থাকে না অথচ এগুলো মাধ্যম বা রিযিক পৌঁছানোর পিয়ন মাত্র। আসল রিযিকদাতা হলেন মহান রাববুল আলামীন। কারো রিযিকের একটা পথ বন্ধ হলে তিনি আরো পথ খুলে দেন। (সূরা মুমিন : ৫১, হুদ : ৬)

১৪. পুরুষেরা যখন কিছুটা বয়স্ক হয়ে যায় এবং কারো ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন সর্ব ক্ষেত্রে তার কথাকেই সত্য বলে মনে করে। বাস্তবতা যাচাই না করে তার কথামতো অন্যের ওপর চড়াও হয়, যা জুলুমের শামিল। এই দুর্বলতা থেকে জ্ঞানী লোকেরাও মুক্ত নয়। (সূরায়ে হুজরাত : ৬)

১৫. অনেকে পিতা-মাতাকে সম্মান করে না। তাদের খোঁজখবর রাখে না। অথচ পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এ জন্য পিতা-মাতার হকসমূহ সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া জরুরি। পিতা-মাতার হায়াতে সাতটি হক এবং মৃত্যুর পরে আরো সাতটি হক রয়েছে। বিস্তারিত জানতে আ'মালুসসুন্নাহ নামক কিতাব দ্রষ্টব্য। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৬৬২)

১৬. অনেক বদমেজাজি পুরুষ সামান্য কারণে স্ত্রীকে মারধর করে থাকে। এমনকি রাগের মাথায় তিন তালাক দিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ-জাতীয় পুরুষরা আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম "আর স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো"(সূরা নিসা, আয়াত ১৯)-এর ওপর আমল করছে না এবং আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৭. অনেক ভবঘুরে স্বামীরা নিয়মিত সংসারের খোঁজখবর রাখে না। তাদের হক আদায়ের কোনো তোয়াক্কা করে না। অনেক মূর্খ মানুষ এটাকে বলে আল্লাহর ওপর ভরসা করি, যা শরীয়তবিরোধী কথা। এটাকে শরীয়তে তাওয়াক্কুল বলা হয় না। অন্যদিকে কিছু পুরুষ বিবিকে চাকরিতে পাঠায়। তাদের বিবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেপর্দাভাবে পয়সা রোজগার করে। এটা খুবই গর্হিত কাজ। কারণ বাড়ির বাইরে গিয়ে এভাবে চাকরি করা তদের দায়িত্বও নয় এবং তা জায়িযও নেই। (সূরা নিসা : ৩৪)

১৮. অনেক ভাই বোনদের পাওনা মীরাস আদায় করতে চায় না। অথচ বোনদের পাওনা আদায় করা ভাইদের ওপর ফরয দায়িত্ব। এটা না করলে তাদের রিযিক হারাম মিশ্রিত হয়ে যায় এবং জান ও মালের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আরো দুঃখজনক কথা হলো, অনেক জালিম পিতাও নিজের মেয়েকে মাহরূম করতে বা কম দিতে চেষ্টা করে থাকে অথচ হাদীস অনুযায়ী এটা সরাসরি জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা। (সূরা বাকারা আয়াত : ১৮৮, মুসনাদে আহমদ, হা. নং ২১১৩৯)

১৯. পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অন্যতম হক হলো, তাদেরকে জরুরত পরিমাণ দ্বীনি ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শরীয়তের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া। কিন্তু অধিকাংশ পিতা-মাতা এ সম্পর্কে উদাসীন। এমনকি সন্তানরা বেনামাযী হলে পিতা-মাতার কোনো পেরেশানি দেখা যায় না। (সূরা তাহরীম : ৬, তারগীব তারহীব, হা. নং ৩০৪৮)

২০. অনেক পুরুষ স্ত্রী, সন্তানের নাজায়িয দাবি পুরা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির বাধ্য হওয়ার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। বরং এতে পরকালের আযাব বৃদ্ধি করা হয়, যার মধ্যে বিবি-বাচ্চারা শরীক হবে না। তবে তাদের আযাব তারা ভিন্নভাবে পাবে। (সূরা ইসরা : ২৬, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৫৭)

২১. স্বামীরা স্ত্রীদের দায়িত্ব তথা সংসার সামলানোকে ছোট নজরে দেখে এবং এটা স্ত্রীর দায়িত্ব মনে করে তাই এটার কোনো মূল্যায়নও করে না। এবং কখনোই স্ত্রীর রান্নাবান্নার এবং অন্যান্য ভালো কাজের শুকরিয়া আদায় ও প্রশংসা করতে চায় না। এতে স্ত্রীরা সংসারিক কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। অথচ স্বামীর সামান্য প্রশংসায় স্ত্রী হাজারো কষ্টের কাজ হাসিমুখে আঞ্জাম দিতে পারে। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫৫)

২২. অনেকে বিয়ের পর স্ত্রীর পক্ষ থেকে যৌতুক গ্রহণ করে। কেউ কেউ যৌতুকটাই ভিন্ন নামে ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। অথচ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বা কৌশল করে কারো থেকে ধন-সম্পদ হাসিল করা হারাম। (সূরা বাকারা আয়াত : ১৮৮, মুসনাদে অহমদ, হা. নং ২১১৩৯)

২৩. পুরুষরা সাধারণত বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক সৌন্দর্য ও বিত্তবৈভবকে দ্বীনদারীর ওপরে

প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ হাদীসে দ্বীনদারীকে সৌন্দর্য ও সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে এবং এরই মধ্যে কামিয়াবী নিহিত আছে বলা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম করলে সুখ-শান্তি তো হয়ই না বরং দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫০৯০)

২৪. অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে, দ্বীনি কোনো সমস্যায় আলেমদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। নিজের আত্মার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য (যা ফরযে আইন) কোনো বুযুর্গ লোকের সান্নিধ্যে যাওয়া প্রয়োজনীয় বা জরুরি কিছু মনে করে না। অথচ আত্মশুদ্ধি অর্জন না করার দরুন "রিয়া"বা লোক দেখান অন্তঃব্যাধির কারণে, সারা জীবনের সকল ইবাদাত-বন্দেগী নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, হাদীসে পাকে যে তিন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম জাহান্নামী বলা হয়েছে তারা আত্মশুদ্ধি না করানোর অপরাধে এ শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে। (সূরা আশশামস : ৯, সূরা নাহল : ৪৩,সহীহ মুসলিম, হা. নং ৪৯২৩)

২৫. যারা কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গর সাথে সম্পর্ক রাখে কিংবা তাবলীগে কয়েক চিল্লা সময় লাগায়, তাদের অনেকের হালাত এই যে, তারা নিজেদেরকে দ্বীনি ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানী মনে করে এবং নিজেকে অনেক কিছু মনে করে, যা তাকাব্বুরের শামিল।

এমনকি কেউ কেউ অন্য আলেমদের সহীহ কথাবার্তাও মানতে চায় না। তাদের কথা সুকৌশলে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের ত্রুটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। এটা মারাত্মক অপরাধ। সঠিক কথা যেই বলুক না কেন, তা গ্রহণ করা জরুরি। (সূরা নিসা-৫৯, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৮১৪০)

২৬. সুশীল সমাজের অনেকে গৃহপরিচারীকাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করে থাকে, আর বাইরে মানবধিকারকর্মী হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করে। তাদের কথায় ও কাজে মিল না থাকায় তারা মুনাফিক সাব্যস্ত হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪৭)

২৭. অনেক নব্য শিক্ষিত লোকেরা কুরআন-হাদীসের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে নিজেকে ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করে। এমনকি হাদীস ও ফিকহের অনেক বিষয়ে দ্বীনের বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী আলেমদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়। এদের ব্যাপারে হাদীসে কঠোর ধমকি এসেছে। এদের উচিত, হক্কানী উলামাদের সমালোচনা ছেড়ে দিয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা. নং ২৬০)

২৮. অনেকে দ্বীন শেখার জন্য আলেমদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। বরং বিভিন্ন ইসলামী(?) টিভি চ্যানেল বা ইন্টারনেট প্রোগ্রামকে দ্বীন শেখার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এবং এসব চ্যানেলের কতিপয় লেকচারারকে এবং কিছু উলামায়ে "ছু" কে নিজেদের ধর্মগুরু মনে করে। অথচ এই সবগুলোই গোমরাহির মাধ্যম। কিয়ামত পর্যন্ত ঈমান ও আমল হাসিলের একমাত্র পথ হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাহচার্য। (সূরা তাওবা : ১১৯, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ৪২৭)

২৯. সাধারণ মানুষ ব্যবসা, লেনদেন, বিবাহ, তালাক ইত্যাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে এর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে উলামাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে না। যখন কঠিন কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়, তখন আলেমদের কাছে ছুটে আসে অথচ পূর্বেই যদি সে আলেমদের সাথে পরামর্শ করে নিত, তাহলে হয়তো এ সমস্যার সম্মুখীন হতো না। অথবা সমাধান দেয়া সহজ হতো। (সূরা নাহল : ৪৩)

৩০. ছেলেরা মনে করে পর্দা করা মেয়েদের দায়িত্ব। আর তাদের দায়িত্ব হলো রাস্তায় বের হয়ে মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা। অথচ কুরআনে পর্দার আলোচনায় মহান রাববুল আলামীন আগে পুরুষদের সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নত করো" এবং কুদৃষ্টিকে হারাম ও লানতের কাজ ঘোষণা করা হয়েছে। তা ছাড়া বিবাহপূর্ব দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা, সম্পর্ক করা কুরআনে হারাম করা হয়েছে। (সূরা নূর : ৩০)

৩১. অনেকে মনে করে তার মধ্যে কোনো দোষ নেই। অথচ তাকাব্বুর, রিয়া ইত্যাদি আত্মার ব্যাধিতে সে ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত। কিন্তু হক্কানী শাইখদের সোহবতে না যাওয়ায় সে নিজেকে ফেরেশতা ভেবে বসে আছে। (সূরা হুজুরাত : ১২)

৩২. যুবকদের মধ্যে মিথ্যার আশ্রয়ে বয়স কমানো, আর বৃদ্ধদের মধ্যে বয়স বাড়ানোর বেশ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উভয়টা ধোঁকা হওয়ার কারণে হারাম। (সহীহ বুখারী, হা. নং ২১৬২)

৩৩. স্ত্রী সম্ভোগ সাধারণভাবে জায়েয হলেও এ ব্যাপারে উত্তম হলো এ কাজটা 'নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো, স্ত্রীর হক আদায় এবং নেক সন্তান লাভের নিয়তে করা।' সেক্ষেত্রে এটা অনেক বড় ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে এবং আল্লাহ এ ধরনের লোকের সাহায্যের দায়িত্ব নেন। (জামে তিরমিযী, হা. নং ১৬৫৫)

৩৪. অনেকে শেষ জীবনে নিজের ওয়ারিশদের জন্য কোনো বিশেষ সম্পদের ওসিয়ত করে থাকে। অথচ ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করা জায়িয নেই। আবার অনেকে হায়াতে সম্পদ বণ্টন করতে গিয়ে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া সন্তানদের মাঝে কমবেশি করে বণ্টন করে থাকে, যা অনুচিত। এতে বান্দার হক নষ্ট করা হয়। হায়াতে সম্পদ বণ্টন করতে চাইলে ছেলেমেয়ে সকলকে সমান দেয়া উত্তম। (সুনানে

দারা কুতনী, ৪/৩৭, ইমদাদুল আহকাম, ৪/৫৫,৫৮৬)

নারীদের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস

১. জরুরি আকায়িদ, ইবাদাত, সহীহ কুরআন তিলাওয়াত, পিতা-মাতা, স্বামীর হক ও সন্তানের হক সম্পর্কে ইলম হাসিল করে না অথচ জরুরত পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফরয। অনেক পিতা-মাতাও এ ব্যাপারে উদাসীন। কিছু দুনিয়াবী ইলম শিক্ষা দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৪)

২. সময়ের পাবন্দি করে না। নামায-ইবাদত, খানা, গোসল ইত্যাদি সকল কাজে তারা দেরি করে; এতে সংশ্লিষ্ট লোকেরা পেরেশান হয়ে যায় এবং অনেক জরুরি কাজ নষ্ট হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১২)

৩. দুই-তিনজন একত্রিত হলে অন্যের দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়। অথচ অন্যের দোষ চর্চা করা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "(হে মুমিনগণ!) তোমরা কারো দোষ অনুসন্ধান করো না। আর একে অন্যের গীবত (অগোচরে দুর্নাম) করো না; তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করে থাকো! আর আল্লাহকে ভয় করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু।" (সূরায়ে হুজুরাত : ১২)

৪. পারস্পরিক সালাম দেয়ার অভ্যাস খুবই কম। নিজ বাবা-মা, ভাইবোন, স্বামী-সন্তানকেও তারা সালাম করতে অভ্যস্ত নয়, এমনকি কেউ তাদেরকে সালাম দিলে উত্তর দেয় না বা শুনিয়ে দেয় না। অথচ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরস্পরে সালাম আদান-প্রদান করতে বলেছেন। (সহীহ বুখারী, হা. নং ২৮)

৫. চোগলখুরি তথা একের কথা অন্যের কাছে লাগানো অনেক মেয়েদের একটা বদ অভ্যাস। এ ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরি। হাদীসে এসেছে যে, এ গুনাহ কবরে আযাব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। (সহীহ বুখারী হাদীস, নং ১৩৭৮)

৬. সাধারণত মেয়েদের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শনের মানসিকতা অধিক লক্ষ করা যায়। যদি তারা সাজসজ্জা করে তাহলে তা একান্তই পরপুরুষ বা অন্য কোনো নারীকে দেখানোর জন্য করে, যা একেবারেই অনুচিত। মেয়েদের উচিত হলো যথাসম্ভব ঘরে বসে স্বামীকে খুশি করার জন্য বেশি বেশি সাজসজ্জা করা, স্বামীর মনকে খুশি করা এবং তার দৃষ্টি হিফাযতের ব্যাপারে সহায়তা করা, এর জন্য মহিলারা আল্লাহর দরবারে অনেক সাওয়াব পাবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬১)

৭. বর্তমান মেয়েরা সাজসজ্জার নামে অনেক নাজায়িয ও হারাম কাজ করে থাকে। যেমন, বিধর্মী ও অসভ্য মেয়েদের মতো স্টাইল করে চুল কাটা, ভ্রুপ্লাক করা, বিউটি পার্লারে গিয়ে গোপন স্থানের লোম পরিষ্কার করানো ইত্যাদি। (সুনানে আবু দাউদ হা. নং ৪০৩১)

৮. মেয়েদের জন্য সমস্ত শরীর আবৃতকারী মোটা কাপড়ের এমন ঢিলেঢালা পোশাক পরা জরুরি, যাতে করে শরীরের রং, ভাঁজ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার-আকৃতি বোঝা না যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকের মেয়েরা অনেকে বোরকা তো চেনেই না আর ঢিলেঢালা পোশাক পরতেও ভুলে গেছে, যার কারণে সমাজে নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলছে। (সূরা নূর : ৩১)

৯. অনেক মেয়েরা বাইরে পর্দা করে বের হলেও পরিবারিক জীবনে পর্দার ধার ধারে না। দেবর, ভাসুরদের সাথে পর্দার কথা চিন্তাও করে না। অথচ এদের সাথে পর্দা করার কথা হাদীসে খুবই গুরুত্বের সাথে এসেছে। ভাসুর ও দেবরকে মৃত্যু সমতুল্য বলা হয়েছে। (জামে তিরমিযী হা. নং ১১৭১)

১০. অনেকে বোরকা পরিধান করে কিন্তু চেহারা খোলা রাখে অথচ চেহারা সকল সৌন্দর্যের সমষ্টি; চেহারা আবৃত করা জরুরি। চেহারা, মাথা, চুল বা উভয় চোখ খোলা থাকলে বোরকা অর্থহীন হয়ে পড়ে, এমন পর্দা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে তারা ফরয তরক করার গুনাহে লিপ্ত হচেছ। আর অনেকে এমন নকশি বোরকা পরে যে তাতে পুরুষদের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায় এবং বোরকার মূল উদ্দেশ্য ভূলুণ্ঠিত হয়। বোরকার মূল উদ্দেশ্য হলো, যাতে তার দিকে কারো আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। (সূরায়ে নূর : ৩১)

১১. কোথাও কোনো প্রয়োজনে যেতে হলে অযথা ঘোরাঘুরি করে যাত্রা বিলম্ব করে। শেষে গন্তব্য স্থানে অসময়ে এবং দুর্যোগ পোহায়ে পৌঁছতে হয়। অথচ অযথা বিলম্ব না করে একটু আগে বের হলেই পথের অনেক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (জামে তিরমিযী হাদীস নং ২৩২৩)

১২. কোনো স্থানে সফরে যাওয়ার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র নিয়ে বিরাট বোঝার সৃষ্টি করে, যা বহন করতে সঙ্গী পুরুষদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। বোঝা বহনের দায়দায়িত্ব পুরুষদের মাথায় চাপিয়ে নিজেরা দিব্যি আরামে সফর করে থাকে। এমনটা করা একেবারেই অনুচিত। (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং ৪৯৯৬)

১৩. হাতে টাকা থাকুক বা না থাকুক, কোনো কিছু পছন্দ হলে তা অপ্রয়োজনীয় হলেও কিনতে হবে। এর জন্য ঋণ করতেও কোনো দ্বিধা করে না। যদি ঋণ নাও করতে হয় তবু নিজ টাকা অপ্রয়োজনে খরচ করা বোকামি ও

গুনাহের কাজ। যথাসম্ভব ঋণ করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এতে যদি কষ্ট হয় হোক। হ্যাঁ, নিজের পছন্দের কোনো জিনিস যদি স্বামীর নিকটও পছন্দনীয় হয় তাহলে ভবিষ্যতে যখন ওই জিনিসের প্রয়োজন পড়বে তখন কিনবে। (সূরা আনআম আয়াত : ১৪১, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪০৮)

১৪. কেউ কোনো উপকার করলে তার শুকরিয়া আদায় করে না। বিশেষত ঘরের বউ-ঝিরা প্রশংসার যোগ্য কোনো কাজ করলেও শাশুড়ি কিংবা ননদরা তার শুকরিয়া আদায় করে না। এটা বড়ই সংকীর্ণমনা হওয়ার পরিচায়ক। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করে না, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার শুকরিয়া কবুল করেন না। তাই কেউ কোনো
প্রশংসাযোগ্য কাজ করলে তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর এর জন্য জাযাকাল্লাহ খাইরান বলবে। এতে যার প্রশংসা করা হয় তার মধ্যে কাজের উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুগুণে বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলাও খুশি হন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫৫)

১৫. শাশুড়িরা অনেক সময় পুত্রবধূদের কাজের মেয়ের মতো মনে করে, কখনোই নিজের মেয়ের মতো মনে করতে পারে না। যার কারণে অধিকাংশ যৌথ পরিবারে পুত্রবধূরা শাশুড়ি কর্তৃক নির্যাতিতা হয় এবং সংসারে কলহের আগুন লেগেই থাকে। সুতরাং পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের সমান মর্যাদা দিতে না পারলে যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে পৃথক করে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ করে দেয়া জরুরি। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪৭, ফাতাওয়ায়ে শামী ৫/৩৬০)

১৬. পুত্রবধূরাও শাশুড়িদেরকে নিজ মায়ের মতো ভাবতে পারে না। শাশুড়িকে তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করে। স্বামীকে নিজের একক সম্পদ মনে করতে চায়। যার কারণে সংসারে অনেক কলহের সৃষ্টি হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৮)

১৭. স্ত্রীরা স্বামীর ইহসান তথা দয়া ও অনুগ্রহ স্বীকার করতে চায় না। কেউ জীবনভর স্ত্রীর সব চাহিদা পূরণ করে এসেছে হঠাৎ একদিন তার কোনো
চাহিদা পূরণ করা হলো না, তখন সে বলে ফেলে তোমার সংসারে এসে জীবনে সুখের মুখ দেখলাম না। এমনটা করা বড়ই অন্যায় ও নাশোকরী এতে স্বামীর মন ভেঙে যায়। এটা মহিলাদের দোযখে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আরেকটি বড় কারণ হলো, কথায় কথায় লানত ও বদ দু'আ করা। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯)

১৮. স্বামী স্ত্রীর জন্য পছন্দ করে কোনো জিনিস আনল, কিন্তু ঘটনাক্রমে স্ত্রীর তা পছন্দ হলো না, তখন স্ত্রী স্বামীর মুখের ওপর বলে দেয় আমার এটা পছন্দ হয়নি; আমি এটা পরবও না ছুঁইবও না। এটা অমানবিক। স্বামী কিছু আনলে পছন্দ না হলেও খুশিমনে গ্রহণ করা উচিত। কারণ স্বামীকে খুশি করাই স্ত্রীর জন্য ইবাদাত। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৯)

১৯. অনেক সময় টাকা, গহনা ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস বালিশের নিচে বা খোলা যায়গায় রেখে দেয়, পরে হারিয়ে গেলে পরিবারের নিরপরাধ লোকদের দোষারোপ করতে থাকে, যা মারাত্মক গুনাহ। এগুলো সব সময় হেফাজতের সাথে নিরাপদ স্থানে রাখবে। (সূরায়ে হুজুরাত ১২, সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৪০৮)

২০. অনেক মহিলার মধ্যে কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতার বেশ অভাব রয়েছে; ব্যস্ততার সময়ে কোনো কাজ তারা ঝটপট করতে পারে না; গতিমন্থরতা যেন তাদের একটা অংশ। এতে অনেক সময় সুযোগ নষ্ট হওয়ার কারণে আসল কাজ পণ্ড হয়ে যায়। অথচ একটু খেয়াল করলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। সুতরাং অতি দ্রুত বা অতি ধীরে কাজ করবে না বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০১২)

২১. দুই ব্যক্তি কোনো বিষয়ে আলাপ করতে থাকলে অনেক মহিলা অযাচিতভাবে সেই কথায় অংশগ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে। এটা বড়ই অভদ্রচিত আচরণ। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো পরামর্শ না চায় ততক্ষণ পর্যন্ত একেবারে বোবা ও বধির হয়ে থাকা উচিত। তেমনি ভাবে কোথাও দু'জন কথাবার্তা বলতে থাকলে আড়াল থেকে তা শ্রবণ করার চেষ্টা করবে না। কারণ এটা নাযায়িয। (সূরায়ে হুজরাত :১২, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৪২, ৬৩৩৭)

২২. কোনো কোনো মহিলা মেয়েমহল থেকে এসে অন্য মহিলাদের অলংকার, শারীরিক গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির বর্ণনা নিজ স্বামীর কাছে করে থাকে। এর দ্বারা স্বামীর মন অন্য মহিলার দিকে আকৃষ্ট হলে যে নিজের কত বড় ক্ষতি হবে সে দিকে বিলকুল খেয়াল করে না। অতএব অন্য মেয়েলোকের রূপের প্রশংসা স্বামীর কাছে কখনো করবে না; এটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার ন্যায় অপরাধ। (মুসনাদে আহমদ,
হাদীস নং ৩৬০৮)

২৩. কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে সে যত জরুরি কথা বা কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন সেদিকে খেয়াল না করে সে নিজের কথা বলবেই, ওই ব্যক্তির কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে না। কিংবা অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। এটা নিতান্তই বোকামি। (সহীহ বুখারী,
হাদীস নং ৬৩৩৭)

২৪. কেউ কিছু বললে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শোনে না; এর মাঝে

অন্য কাজ করতে থাকে বা ফাঁকে ফাঁকে কারো কথার উত্তর দিতে থাকে। ফলে বক্তা মনে কষ্ট পায় এবং সে যে জরুরি কথাগুলো বলতে এসেছে তার অনেকটাই শোনাতে ব্যর্থ হয়। এমনকি পরে কৈফিয়ত চাইলে বলে যে, এ কথা তো আপনি আমাকে বলেননি। অথচ বলা হয়েছে সে মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। (সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৯৯৬)

২৫. নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করতে চায় না। বরং যথাসম্ভব কথার ফুলঝুরি দিয়ে দোষ চাপা দিতে চায়; চাই তার কথার মধ্যে যুক্তি থাক বা না থাক। এটা খুবই গর্হিত কাজ; ভুল হলে তা সাথে সাথে স্বীকার করে নেবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আশ্বাস দেবে। কারো হক নষ্ট করে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ চেয়ে নিতে দ্বিধা করবে না, কারণ অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৮)

২৬. কোনো কথা বা সংবাদ বলতে গেলে অসম্পূর্ণ বলে থাকে, যদ্দরুন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং আসল কাজ ব্যাহত হয়। সুতরাং কথা বলার সময় বুঝিয়ে সম্পূর্ণ কথা বা ঘটনা খুলে বলবে যেন কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং ৪৯৯৬)

২৭. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার বা আসার সময় অনেক মহিলা অবশ্যই একটু কাঁদবে। কাঁন্না না এলেও কান্নার ভান করবে, অন্যথায় লোকেরা বলতে পারে যে মেয়েটার মনে একটুও মায়া নেই, কত পাষাণ। এই খোঁটা থেকে বাঁচার জন্য কৃত্রিম কান্না হলেও তাদের কাঁদা চাই। অথচ এটা ভুল প্রথা।(সূরা সদ : ৮৬)

২৮. অলসতাবশত ফরয গোসল করতে দেরি করা অনেক মহিলার একটা চিরাচরিত অভ্যাস। আজকে বিকালে কারো মাসিক বন্ধ হলো, তা সত্ত্বেও সে অবশ্যই পরদিন দুপুরে গোসল করবে। আর এদিকে তিন-চার ওয়াক্ত নামায স্বেচ্ছায় কাযা করে ফেলবে। অবশ্য অধিকাংশ মেয়েরা এ কথা জানে না যে, মাসিক যখনই বন্ধ হয়, তখনই গোসল করে নামায পড়া শুরু করতে হয়। চাই মাসিক সন্ধ্যার আগে বন্ধ হোক বা ফজরের আগে বন্ধ হোক। কোনো ওয়াক্তের শেষের দিকে মাসিক বন্ধ হলেও ওই ওয়াক্তের নামায তার জিম্মায় ফরয হয়ে যায়। ওয়াক্তের মধ্যে সময় না পেলে কাযা পড়া জরুরি। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২৩, ফাতাওয়ায়ে শামী, খ.১ পৃ. ৩৩৪ রশীদিয়্যাহ)

২৯. বর্তমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা অনেক মেয়ে উযু-গোসল সম্পর্কীয় মাসআলা-মাসায়েলও জানে না। গোসল কখন ফরয হয়, ফরয গোসল কিভাবে করতে হয়, এ ধরনের অতীব জরুরি কিন্তু সহজ মাসআলা সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। মুসলমানের সন্তান হয়েও যারা এতটুকু জানে না, তাদের জন্য বড় বিস্ময়!! তবে এর জন্য শুধু তারা নয় তাদের বাবা-মাও দায়ী হবেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীন নং ২২৪)

৩০. অনেক মহিলা স্বামী কর্মস্থান থেকে ফেরার সাথে সাথে তাকে শান্তি পৌঁছানোর পরিবর্তে, তার কানে সংসারের কলহ বিবাদের কথা পৌঁছায়। যদ্দরুন অল্পতেই স্বামীর মেজাজ বিগড়ে সামান্য বিষয়ে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে। তাই তেমন কিছু হয়ে থাকলে স্বামীর শরীর ও মন স্বাভাবিক ও শান্ত হওয়ার পর বলা এবং সঠিক সংবাদ বলা যাতে স্বামী বিষয়টা তদন্ত করলে মিথ্যুক সাব্যস্ত হতে না হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪)

৩১. অনেক ননদ ভাইবৌদের সহ্য করতে পারে না, এমনিভাবে অনেক ভাই বৌননদদের সহ্য করতে পারে না। এই মনোভাব সংসারকে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। সবার সাথে সুসম্পর্ক-সদ্ভাব বজায় রাখা এবং মিলমহব্বতের সাথে থাকা শরীয়তে কাম্য। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২২৯০৬)

৩২. অনেক মেয়েলোক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং নিজের শরীর, পোশাক, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩)

৩৩. কোনো সন্তানকে হয়তো বেশি মহব্বত করে তার জন্য অনেক কিছু করে, এমনকি তার দোষ স্বীকার করতে চায় না। এটা ঠিক নয়। যোগ্যতার কারণে কারো প্রতি মহব্বত বেশি থাকতে পারে; কিন্তু দেয়া-নেয়ার ব্যাপারে সব সন্তানকে একই নজরে দেখা ইনসাফের দাবি। এর ব্যতিক্রম করলে অন্যদের ওপর জুলুম করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৮৭)

৩৪. অনেক মহিলা রোগশোক চাপা দিয়ে রাখে, কাউকে বলে না। অনেক জিজ্ঞাসার পরে বললেও ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। ওষুধ এনে দিলে তাও ঠিকমতো খায় না। এতে অনেক পেরেশানি হয়। রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে চিকিৎসার অযোগ্য হয়ে যায়। এটা বড়ই বোকামি। শরীর স্বাস্থ্য আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নিয়ামত। এটাকে সুস্থ রাখা জরুরি, যাতে করে এ শরীর দিয়ে দ্বীন-দুনিয়ার ভালো কাজ আনজাম দেয়া যায়। (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৩৮৫৫)

৩৫. অনেক শিক্ষিতা মহিলা স্বামীর ঘরে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার চেয়ে বাইরে গিয়ে চাকরি করাকে বেশি পছন্দ করে। অথচ সংসারের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর দায়িত্ব। তার দায়িত্ব হলো সন্তান ও সংসার সামলানো। (সূরা নিসা : ৩৪)

অলিমা কখন ও কিভাবে

মুফতী শরীফুল আজম

ইসলাম একটি স্বভাবজাত ধর্ম। মানুষের সকল বৈধ চাহিদা বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয়েছে এর বিধিবিধান আর নীতিমালা। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা আর সুখ-দুঃখ সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দিকনির্দেশনা, যা পরিপালনে মানুষের প্রতিটি চাহিদা পরিণত হয় ইবাদতে। বিয়ে-শাদী নারী-পুরুষের জীবনের বহু প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত অধ্যায়। বাস্তব বলতে গেলে ব্যক্তিজীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ও খুশির মুহূর্ত। মানব জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে ইসলাম নীরব ভূমিকা পালন করতে পারে না। লাগামহীন ছেড়ে দিতে পারে না আদম সন্তানকে। তাই বাস্তব এই চাহিদাকে ইবাদতে রূপ দিতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন–

النكاح من سنتى(ابن ماجة ١/١٣٢)

"বিবাহ-শাদী আমার সুন্নাত।" সুন্নাতকে তো আর মনগড়া পদ্ধতিতে আদায় করা যায় না। বরং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পন্থায় পালন করতে হয়। ব্যস, এই ঘোষণাতেই একটি মানব চাহিদা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। প্রণীত হলো এর জন্য অনেক বিধিবিধান আর ধারা-উপধারা।

অলিমা :

বিয়ে-শাদীর অন্যতম পর্ব হচ্ছে আপ্যায়ন। আপ্যায়ন এমনিতেই মানুষের স্বভাবজাত বিষয় ও সামাজিকতার অংশ। বিয়ে-শাদীর সময় তো এর গুরুত্ব আরো বহু গুণে বেড়ে যায়। ইসলাম কিন্তু এতে বাদ সাধেনি। বরং এই আপ্যায়নকে ইবাদতে রূপান্তরিত করতে দিয়েছে পবিত্র বিধান। যাতে নেই কারো প্রতি জুলুম, পীড়াপীড়ি বা কোনো রূপ বাধ্যবাধকতা। চোখলজ্জার ভয়েও সাধ্যের বাইরে ধারদেনা করে কিছু করারও অবকাশ নেই বিবাহ-উত্তর আপ্যায়ন তথা অলিমার মাঝে।

শাব্দিক অর্থ :

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, وليـــــمة অলিমা আরবী শব্দটি মূল ধাতু ولـــــم থেকে নির্গত। অর্থ মিলিত হওয়া। যেহেতু এটি বর-কনের মিলনোত্তর হয়ে থাকে তাই উক্ত ভোজকে অলিমা বলা হয়। (ওমদাতুল কারী ২০/১১৪)

আভিধানিক অর্থে অলিমা যেকোনো ভোজ বা ভোজসভাকে বলা হয়। তবে পরিভাষায় বিশেষ ভোজ, যা নবদম্পতি বাসর রাত যাপনের পর আয়োজন করা হয় তাকেই অলিমা বলে। আর তার আয়োজক হয় বরপক্ষ। কনের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন ইসলাম সমর্থন করে না। এখানে এক নিগূঢ় রহস্য রয়েছে। ইসলাম সাম্যের ধর্ম, মানবতার ধর্ম। শোকের ক্ষেত্রে ইসলাম আপ্যায়নের বিধান রাখেনি। রেখেছে আনন্দের মুহূর্তে। যেমন মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন শরীয়ত সমর্থন করে না, চাই তা কুলখানী, চল্লিশা বা অন্য যেকোনো নামেই হোক। যে ঘরে শোকের মাতম সেখানে ভুরিভোজ অমানবিক। হ্যাঁ, ঘরে নবজাতকের আগমন হলে আক্বিকার দাওয়াত করে ধনী-গরিব সকলকে নিয়ে আনন্দ প্রকাশের বিধান ইসলামে রয়েছে।

ঠিক বিবাহের ক্ষেত্রেও এই মানবিক শিক্ষা বিদ্যমান। আদরের দুলালিকে যোগ্য পাত্রে পাত্রস্থ করা যদিও খুশির বিষয় কিন্তু মা-বাবার মন তো আর সেই বিয়োগ বেদনা সহজে চেপে যেতে পারে না। দীর্ঘদিন যে সন্তানকে কোলে-কাঁধে করে লালনপালন করেছে তার বিদায়ক্ষণে ব্যথাতুর হৃদয়ে হতে থাকে রক্তক্ষরণ। কলিজার টুকরা প্রিয় কন্যার বিচ্ছেদের এ বেদনা চিরদিনের বিদায় বেদনার চেয়ে যেন কোনো অংশেই কম নয়। তাই শোকের এমন পরিবেশে শোকার্ত পরিবারে ভুরিভোজের আয়োজন সত্যিই অমানবিক। সত্য ধর্ম ইসলাম এ সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। কনের বাড়িতে অলিমার ব্যবস্থা না রেখে বরের বাড়িতে রেখেছে। যেখানে সকলের মুখে মুখে হাসি। চিত্তভরা আনন্দ। ছোট-বড় সবার মাঝে এক কর্মচাঞ্চল্য। নববধূকে বরণ করতে গোটা বাড়িতে সাজ সাজ রব। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনে বিশেষ আপ্যায়ন, আতিথেয়তা আর আহার-বিহারের উপযোগী পরিবেশ। এখানেই সাজে অলিমার আয়োজন। বাস্তব এই চাহিদাকে অলিমা আখ্যা দিয়ে করা হয়েছে সুন্নাত। তাই ইসলাম সুন্দর, বাস্তবমুখী ও মানবতার ধর্ম।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অলিমা :

ইসলাম মানুষের জীবনযাপনের জন্য কতেক দৃষ্টিভঙ্গি আর দর্শন ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ আগমন করে হাতে-কলমে সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। বরযাত্রা নয় বরং অলিমার শিক্ষা খোদ নবীজি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাস্তব জীবনে বিদ্যমান। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমনের সময় আমার বয়স ছিল দশ বছর। আমার মা আমাকে সর্বদা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতরত থাকতে বলতেন। লাগাতার দশ বছর আমি তাঁর খেদমতে নিয়োজিত

ছিলাম। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইন্তিকাল করেন আমার বয়স তখন বিশ। পর্দা সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। সর্বপ্রথম এর বিধান কখন অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তা জানি। জয়নাব বিনতে যাহশের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথে বাসর যাপনের পরদিন লোকজনকে দাওয়াত করলেন। সকলে আপ্যায়ন গ্রহণ করলেন। এরপর হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া সকলে চলে গেলেন। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে তাঁরা দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। অবশেষে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই উঠে বাইরে চলে গেলেন। সাথে সাথে আমিও বের হলাম, যাতে সকলে বেরিয়ে চলে যায়। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমিও চলতে লাগলাম। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ঘরের দরজার কাছে এসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকলে চলে গেছে ভেবে ফিরে এলেন। আমিও সঙ্গে ফিরলাম। জয়নাব (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন একি কাণ্ড তারা এখনো বসে আছে যায়নি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার ফিরে গেলেন, সাথে আমিও। এবারও হযরত আয়েশার (রা.) ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে সকলে চলে গেছে মনে করে ফিরে এলেন। আমিও সঙ্গে এলাম। ইতিমধ্যে সকলে চলে গেছেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার সামনে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন এবং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো। (বুখারী শরীফ)

উম্মতের জন্য নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাস্তব জীবনের এ ঘটনার মাঝে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে–

(ক) অলিমা করা নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত।

(খ) বাসর যাপনের পরদিন অলিমা আদায়ের মূল সময়।

(গ) আশপাশে সহজে যাদেরকে পাওয়া যায় তাদের নিয়েই অলিমার সুন্নাত আদায় করা যায়।

(ঘ) দাওয়াত খেয়ে মেজবানের গৃহে বেশিক্ষণ দেরি করা বিরক্তিকর, তাই পরিহারযোগ্য।

(ঙ) মেহমানের আচরণে কষ্ট পেলে পাল্টা অসৌজন্যতা প্রদর্শন না করে ইশারা-ইঙ্গিতে কষ্টের কথা বোঝানোর চেষ্টা করা।

সাহাবীদের (রা.) অলিমা :

মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ইসলাম নিয়ে বাঁচার জন্য হিজরত করে সবেমাত্র মদীনায় আগমন করেছে রাসূলপ্রেমিক সাহাবাদের দল। যাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ। মদীনাবাসী সা'আদ ইবনে রবির সাথে তিনি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মুহাজির ভাইকে পেয়ে সা'আদ, যারপরনাই খুশি। জানমাল সব কিছু হারাহারি বণ্টনের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু যে মুহাজির আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতে ভিটেমাটি, ধন-সম্পদ ফেলে মদীনায় পাড়ি জমিয়েছে এক আনসারী ভাইয়ের মালের প্রতি তার কী আকর্ষণ থাকতে পারে? হাসি মুখে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন বারাকাল্লাহ। আপনার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করুন। এসব আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে বাজার চিনিয়ে দিন। নিজেই উপার্জন করে নেব। বাজারে গিয়ে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ব্যবসা শুরু করলেন। এতে কিছু পনির ও ঘি মুনাফা হলো। এভাবে তাঁর সময় কাটতে লাগল। দিনকয়েক পর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। গায়ে জাফরান রঙের ছিটেফোটা পরিলক্ষিত হতে দেখে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুর রহমান! তোমার খোঁজখবর কী? বললেন, মদীনাবাসী এক আনসারী রমণীকে বিয়ে করেছি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, মোহরানা কী দিয়েছো? বললেন, পাঁচ দেরহাম স্বর্ণ। তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, اولم ولو بشاة তুমি অলিমা করো, যদিও একটি ছাগল দিয়ে হয়। (বুখারী)

এই হচ্ছে সাহাবাদের (রা.) সাদাসিধা যিন্দেগীর বাস্তব নমুনা, যেমনটি তারা শিখেছিলেন নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে। তাদের বিয়ে-শাদীতে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। সাহাবীর বিয়ের সংবাদও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরে জানতে পারলেন। মদীনা শরীফের আয়তন যে তখন খুব একটা বড় ছিল না, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবুও সংবাদ দেরিতে পৌঁছল এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অলিমা করার কথা বলে দিলেন। এখানে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হচ্ছে–

(ক) বিবাহকালীন বরের জন্য বৈধ সাজসজ্জা কাম্য।

(খ) অলিমা কমবেশি যা-ই হোক, সাধ্যমতো করা সুন্নাত।

(গ) বিয়ের সংবাদ বা দাওয়াত না পেলে মান-অভিমান করা অনুচিত।

সামর্থ্যভেদে অলিমা :

অলিমা সুন্নাত, তবে তা হতে হবে সামর্থ্যের ভেতর থেকে। চোখলজ্জায় ধারদেনা করে বড় আকারে ভোজসভা করা শরীয়তে কাম্য নয়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন-যেমন সুযোগ পেয়েছেন অলিমা করেছেন। এর জন্য তিনি কমবেশি কোনো সীমা বেঁধে দেননি। যেমন সদ্য হিজরত করে আসা সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে সম্ভব হলে ছাগল দিয়ে অলিমা করার কথা বলেছেন। আবার নিজেও কখনো ছাগল দিয়ে করেছেন। হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জয়নাব (রা.)-এর অলিমার মতো অন্য কারো অলিমা করেননি। তাঁর অলিমা করেছিলেন ছাগল দিয়ে। (বুখারী)

আবার কোনো বিয়েতে হালুয়া দিয়ে অলিমা করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর বিয়েতে حيس দিয়ে অলিমা করেছেন। যা পনির, ঘি এবং খেজুর মিশ্রিত হালুয়াবিশেষ। (বুখারী)

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বিয়েতে অলিমা করা হয় পৌনে দুই সের যব দিয়ে। হযরত সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোনো এক স্ত্রীর অলিমা দুই মুদ্দ পৌনে দুই সের) যব দিয়ে আদায় করেন। (বুখারী)

আবার সচ্ছলতার সময় বেশি করে অলিমা আদায়ের দৃষ্টান্তও নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে রয়েছে। যেমন হযরত মাইমুনা (রা.)-এর বিয়েতে তিনি করেছিলেন।

সাহাবাদের মাঝেও অনেকে সচ্ছল ছিলেন। এমনই এক সাহাবী হযরত মালেক বিন রবি'আ (রা.)-এর অলিমার ঘটনা হযরত সাহল (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু উসাইদ সায়েদী তাঁর বিবাহের অলিমায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাদের দাওয়াত করলেন। তাঁর নববধূ উম্মে উসাইদ নিজেই খাবার রান্না ও পরিবেশন করলেন। পাথরের একটি পাত্রে রাত থেকে খেজুর ভিজিয়ে বিশেষ পানীয় তৈরি করেছিলেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবার শেষ করলে ওই পানীয় বিশেষ উপঢৌকন হিসেবে শুধুমাত্র নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য পরিবেশন করলেন। (বুখারী)

অতএব এ সকল বাস্তব উপমা থেকে আমরা যা শিখতে পাই তা হচ্ছে-

(ক) সামান্য খেজুর থেকে নিয়ে সাধ্যমতো যেকোনো খাবার দিয়ে অলিমা আদায় করা যায়।

(খ) স্বাস্থ্যসম্মত হালাল পানীয় বা শরবত অলিমাতে পরিবেশন করা যায়।

(গ) মেহমানদের মাঝে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাউকে বিশেষ কোনো খাবার পানীয় দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা যায়।

(ঘ) নববধূর জন্য প্রয়োজনীয় কাজে হাত লাগানো দোষণীয় কিছু নয়।

(ঙ) একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে সামর্থ্যভেদে অলিমার মাঝে তারতম্য করা যায়, এ ক্ষেত্রে বরাবর করা জরুরি নয়।

সাধারণ খাবারে তুষ্টি প্রকাশ :

অলিমার মতো একটি সহজ সুন্নাত আদায় কঠিন করে দেয় মেহমানদের খুশি করতে না পারার শঙ্কা। তাই মেহমানদের মনোভাব বা আদর্শ এমন হওয়া উচিত, যাতে মেজবানের পক্ষে সুন্নাতটির আদায় সহজ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা অতুলনীয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমাকে ছাগলের নলির দাওয়াত দিলেও আমি তা কবুল করে নেব। আর যদি সামনের পায়া হাদিয়া দেয়া হয় তাও গ্রহণ করব। (বুখারী)

এটা ছিল নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্র মাধুর্য। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি আমরাও মেজবানের সামান্য আপ্যায়নে তুষ্ট থাকি, হাসিমুখে গ্রহণ করে তাকে মুবারকবাদ জানাই তবে অলিমার মতো একটি সুন্নাত সহজে আদায় হতে পারে।

অলিমার সঠিক সময় :

অলিমার সময় নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। মালেকীদের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, বাসরের পর করা মুস্তাহাব। তাদের কারো কারো মতে বিবাহের মজলিসে করা সুন্নাত। ইবনে হাবীবের মতে, বিবাহের মজলিসে ও বাসরের পর। অন্যত্র তিনি বলেন, বাসরের আগে পরে দুটোই জায়েয। তবে হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বাসরের পর দিন হচ্ছে অলিমার প্রকৃত সময়। (ওমদাতুল কারী ২০/১১৪)

হযরত জয়নাব (রা.)সহ অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনগণের অলিমার ঘটনাই যার প্রমাণ।

তা ছাড়া অলিমা শব্দের মূল ধাতু ও অর্থগত দিক বিবেচনা করলেও মিলনের পর হওয়াটাই প্রাধান্য পায়। পূর্বে অলিমার শাব্দিক অর্থের আলোচনায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বলেন,

السنة فى الوليمة ان تكون بعد البناء وطعام ماقبل البناء لا يقال له وليمة عربية

বাসর যাপনের পর অলিমা করাই প্রকৃত সুন্নাত। এর পূর্বের কোনো আপ্যায়নকে আরবী ভাষায় অলিমা বলা হয় না। (ফাইযুল বারী ৫/৫৩৪)

এ ব্যাপারে ফেকাহ ও ফাতাওয়া গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। যেমন ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে আছে-

ووليمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة وهى اذا بنى الرجل بامرأته (الفتاوى الهنديه ٥/٣٤٣)

ওলিমা করা সুন্নাত, এতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। এটা বাসর যাপনের পর হয়ে থাকে।

আল ফিকহুল হানাফিতে উল্লেখ আছে-

وتكون الوليمة بعد الدخول لانه عليه السلام قال لابن عوف بعد ما رأى عليه علامات النكاح (الفقه الحنفى ٢/١٨٦)

অলিমা সহবাসের পর হয়ে থাকে, কেননা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ইবনে আউফ (রা.)-এর গায়ে বিবাহের লক্ষণ দেখার পর অলিমা করার কথা বলে ছিলেন।

ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়্যাতে এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে-

জিজ্ঞাসা : অলিমা কখন করবে? নির্জনবাসের পূর্বে না পরে?

জবাব : অলিমার দাওয়াত নব দম্পতির একত্রবাসের পর খাওয়ানো হয়। (৩/১২৫)

খাইরুল ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে-

জিজ্ঞাসা : অলিমার দাওয়াত বাসর যাপনের পর সুন্নত না, এর পূর্বে?

জবাব : বাসর যাপনের পর হওয়াই অলিমার আসল সুন্নাত। যদিও অনেকে এর পূর্বের কথাও লিখেছেন। (৩/৬০৩)

এমদাদুল আহকামে এ মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে-

জিজ্ঞাসা : সহবাস করা ছাড়া অলিমা জায়েয কি না?

জবাব : প্রসিদ্ধ মতানুসারে অলিমা ওই দাওয়াতকে বলা হয় যা বাসর রাত্রি ও সহবাসের পর আয়োজন করা হয়। কারো মতে, বিবাহের সময় থেকে সহবাসের পর পর্যন্ত যে দাওয়াত হবে, তা অলিমা বলে গণ্য হবে। তবে প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য, কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহবাসের পরই অলিমা প্রমাণিত। (৪/২৯১)

এ সকল আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আনন্দ প্রকাশের যে উদ্দেশ্যে শরীয়তে অলিমার বিধান রাখা হয়েছে, তা নব দম্পতির নির্জনবাস তথা বাসর যাপনের পরই পূর্ণাঙ্গরূপে হয়ে থাকে। তাই এ সময়ে অলিমা করাই প্রকৃত সুন্নাত। হ্যাঁ, এর আগেও যদি কেহ অলিমা করে তবে তা যথাসময়ে না হলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

নির্জনবাসের পূর্বে অলিমা :

যদিও বাসর যাপনের পরের দাওয়াতই মূলত অলিমা হিসেবে স্বীকৃত, তথাপি বিয়ের মজলিসে বা বিয়ের পর বাসরের পূর্বের দাওয়াতও এক হিসেবে অলিমার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অলিমার সুন্নাতের মাঝে মূলত দুটি দিক রয়েছে।

এক. আপ্যায়ন করা।

দুই. যথাসময়ে করা।

বাসরের পূর্বে করা হলে আপ্যায়নের সুন্নাতটি আদায় হয়ে যাবে।

মুসতাদরাকে হাকেম গ্রন্থে একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) স্বামীসহ হাবশায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং তাঁকে ত্যাগ করে। তাঁর এ দুর্দশার খবর পেয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদশাহ নাজ্জাশিকে উম্মে হাবীবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ এবং নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে বিবাহ পরিয়ে দেয়ার উকিল নিযুক্ত করে পত্র প্রেরণ করেন। নির্দেশ পেয়ে বাদশাহ বিবাহের সব আয়োজন সম্পাদন করেন। বিবাহের পর উপস্থিত সকলের জন্য অলিমার আয়োজন করেন।

এলাউসসুনান গ্রন্থে মাও. যুফর আহমদ উসমানী (রহ.) উক্ত ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেন-

قلت: وليس ذلك بوليمة بل هو طعام التزويج ويلتحق به ما تعارفه المسلمون من نثر التمر ونحوه في مجلس النكاح (اعلاء السنن ٨/٣٦٤٦)

এটা মূলত অলিমা নয় বরং বিয়ের খাবার, যা বিয়ের মজলিসে খেজুর ইত্যাদি ছিটানোর প্রচলনের মতো একটি বিষয়।

ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দে এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে-

الغرض خواہ نکاح کے بعد ولیمہ کرے یا رخصت کے بعد کرے سنت ولیمہ حاصل ہوجاوے گی۔

মোটকথা, অলিমা চাই বিয়ের পর করা হোক বা নববধূকে উঠিয়ে আনার পর করা হোক, সর্বাবস্থায় অলিমার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৭/১৬৭)

বিষয়টি উদাহরণসহ আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে, ফাতাওয়ায়ে উসমানির এক স্থানে-

অলিমা আদায়ের সুন্নাত ওয়াক্ত হচ্ছে সহবাসোত্তর করা। যারা বিয়ের মজলিসে বা বিয়ে পড়ানো শেষে অলিমা করা সুন্নাত বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, ওই সময় অলিমা করলে অলিমার আপ্যায়নের সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। যেমন মেসওয়াকের মাস'আলার বেলায় বলা হয় যে, ব্রাশ করা দ্বারা মেসওয়াক করার সুন্নাত আদায় হয়ে যায়; কিন্তু মেসওয়াকের (গাছের ডাল) সুন্নাত আদায় হয় না। তদ্রূপ এখানেও আপ্যায়নের সুন্নাত আদায় হয়ে গেছে কিন্তু যথাসময়ে হওয়ার সুন্নাত আদায় হয়নি। (ফতাওয়ায়ে উসমানী ২/৩০২)

দেরিতে অলিমা :

যদিও বাসর যাপনের পরদিনই হচ্ছে অলিমার প্রকৃত সময়; কিন্তু কোনো কারণে ২-৪ দিন দেরি হলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। দ্রুত করার চেষ্টা করতে হবে। যত আগে হবে, ততই সুন্নাতের নিকটবর্তী সময়ে হবে।

فتاوی عثمانی: ۳۰۲/۲: ولیمہ کرنا سنت موکدہ ہے، اس کا وقت زفاف کے بعد ہے، جس قدر جلد کیا جائے اتنا ہی سنت سے قریب ہوگا، چار پانچ دن کے بعد ولیمہ کیا جائے تو سنت ولیمہ ادا ہوجائے گی۔

آپ کے مسائل اور انکا حل ۳۱۰/۶: سوال ولیمہ کرنا سنت ہے مگر کب تک کر سکتے ہیں؟ کیا دوسرے روز ہی کرنا سنت ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ سے دو تین روز بعد سنت ہوگا یا نہیں؟ یعنی سنت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟

جواب: اصل سنت تو دوسرے روز ہی ہے، بامر مجبوری ایک دو روز تاخیر ہوجائے تب بھی حرج نہیں۔

লাগাতার অলিমা :

অধিক মেহমান দাওয়াত করার কারণে এক দিনে আপ্যায়ন সম্ভব না হলে একাধিক দিন দিনব্যাপী অলিমা করার অবকাশ রয়েছে। এতে তিন দিন অতিক্রম হলেও কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে লোক দেখানোর নিয়তে একই ব্যক্তিদের জন্য লাগাতার দুই দিনের বেশি অলিমা করা নিষেধ। ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের একটি অধ্যায়ের শিরোনামে সাত দিন বা এর চেয়ে বেশি অলিমা করা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক

দিন বা দুই দিন সময় বেঁধে দেননি।

باب اجابة الوليمة والدعوة ومن اولم سبعة ايام ونحوه ولم يوقت النبى ﷺ يوما ولا يومين (بخارى)

তবে তিনি এর স্বপক্ষে সরাসরি কোনো হাদীস উল্লেখ না করে অলিমার দাওয়াত গ্রহণের ব্যাপক নির্দেশনামূলক হাদীস এনে এ কথার প্রমাণ পেশ করেছেন যে,

اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها (بخارى)

হাদীসটি ব্যাপক নির্দেশ বহন করছে এখানে কোনো সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। তাই সাত দিনব্যাপী আয়োজিত অলিমাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তবে বাইহাকী শরীফে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দলিল হতে পারে। উক্ত হাদীস মতে হযরত সিরীন (রা.) সাত দিনব্যাপী অলিমার আয়োজন করেন। যাতে ব্যাপকসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। আনসারী সাহাবাদের পালা আসলে হযরত উবাই ইবনে কা'আব এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)সহ অন্য সাহাবাগণকে দাওয়াত করা হলো। উবাই (রা.) সেদিন রোযা ছিলেন। সকলে খাওয়াদাওয়া শেষ করলে তিনি দু'আ করলেন। (বাইহাকী, আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে শাইবা)

হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সাফিয়্যাহ (রা.) কে বিয়ে করেন এবং তিন দিনব্যাপী অলিমা করেন।

تزوج النبى ﷺ صفية، وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة ايام (رواه ابو يعلى ٤٣٨٣/٦)

আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) মাও. জাফর আহমদ উসমানী ও শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহাদের মতে লোক দেখানো উদ্দেশ্য না হলে অধিক মেহমানদের জন্য সাত দিন বা এর চেয়ে বেশি লাগাতার অলিমার আয়োজন বৈধ।

বিস্তারিত দেখুন ফাতহুল বারী, আওজাযুল মাসালিক, ইলাউসসুনান ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে লৌকিকতার উদ্দেশ্যে লাগাতার অলিমা করা নিষেধ।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

الوليمة اول يوم حق والثانى معروف واليوم الثالث سمعة وريآء (رواه ابوداود ٣٧٤٥)

প্রথম দিন অলিমা করা শরীয়তসম্মত, দ্বিতীয় দিন বৈধ, তৃতীয় দিন লৌকিকতা। (আবু দাউদ)

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রা.) এবং হযরত হাসান বসরী (রা.) দুই দিন অলিমার দাওয়াত কবুল করেন। তৃতীয় দিন পুনরায় দাওয়াত দেয়া হলে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বোঝা গেল, অলিমা এক বা দুই দিন করা যাবে, একই মেহমানকে এর চেয়ে বেশি দাওয়াত করলে তাতে লৌকিকতার ভয় থাকে বিধায় নিষেধ। হ্যাঁ, ভিন্ন ভিন্ন মেহমানকে দুই দিনের চেয়ে বেশি দাওয়াত করে খাওয়ানো নিষেধ নয়।

وقال ابن حبيب يكره ان يكون استدامته اياما واما ان يدعو فى اليوم الثالث من لم يكن دعاه او من دعاه مرة فذلك سائغ ، وقال العمرانى انما تكره اذا كان المدعو فى الثالث هو المدعو فى الاول (اوجز المسالك ٣٢١،٣٢٢/٤)

অলিমার শর্ত :

সুন্নাত তরীকায় অলিমা আদায় করার কিছু শর্ত রয়েছে।

(১) গরিবদেরকেও দাওয়াত করা।

(২) সামর্থ্য অনুপাতে করা।

(৩) ঋণ করে না করা।

(৪) লৌকিকতা বা নামযশের মানসিকতা না থাকা

(৫) অতিরঞ্জন পরিহার করা।

(৬) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সুন্নাত আদায়ের নিয়তে করা।

(৭) শরীয়ত গর্হিত সকল কর্মকাণ্ড মুক্ত হওয়া।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১১

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

অগ্রিম বেচাকেনা, লেনদেন একসাথে :

১. উদাহরণস্বরূপ আজকে স্বর্ণের মূল্য তোলাপ্রতি ৩০ হাজার টাকা। বেচাকেনাও করল, মাল অল্পক্ষণ পরে পাওয়া যাবে, যখন মাল পাওয়া যাবে তাৎক্ষণিক মূল্যও পরিশোধ করা হবে। অনেক সময় উক্ত অল্প সময় অর্থাৎ বেচাকেনা এবং লেনদেনের মধ্যবর্তী সময়ে মূল্যের ব্যবধান হয়ে যায়। যথা মাল ও মূল্য পরিশোধের সময় হয়তো তোলাপ্রতি ৩১০০০ টাকা বা ২৯০০০ টাকা হয়ে গেল। তাই উক্ত ব্যবধানের কারণে মূল্য পরিশোধ বেচাকেনার দরে হবে নাকি মূল্য পরিশোধের সময়ের বাজারদরে হবে? এ বিষয়ে শরীয়তের আর্জি হলো, উক্ত পদ্ধতি যদি আকদেবায় এর ভিত্তিতে হয় তাহলে নাজায়িয হবে। কেননা উক্ত পদ্ধতিটি দাইনের বিনিময়ে দাইন, অর্থাৎ ঋণের বিনিময়ে ঋণ হবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। তবে উক্ত মূয়ামালা (Transaction) কে ওয়াদা বা (Promise) পর্যায়ে ধরা হয় তাহলে তা শরীয়তসম্মত হতে পারে। অর্থাৎ পক্ষদ্বয় পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, অমুক দিন আমরা এই বেচাকেনাটা করব। এবং ওই দিন উভয়ে লেনদেন সম্পাদন করবে ওয়াদাকৃত মূল্য মতে। লেনদেনের দিন পূর্বে ধার্যকৃত মূল্যই ধর্তব্য হবে। এবং উভয়ের সন্তুষ্টিতে ধার্যকৃত মূল্য থেকে উভয়ে কমবেশও করতে পারে।

২. উক্ত পদ্ধতি ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতিতে বেচাকেনা করা যায়–

(ক) স্বর্ণের দর বর্তমান দর থেকে কিছু পরিমানে কম বা বেশি ধরা হবে তবে মাল পরের দিন পাওয়া যাবে যখন মাল পাওয়া যাবে তখন মূল্য পরিশোধ করা হবে।

(খ) স্বর্ণের দর বর্তমান দর থেকে এক-চতুর্থাংশ কম বা বেশি ধার্য করা হবে। তবে মাল এক সপ্তাহের মধ্যে যেকোনো দিন ক্রেতাকে হস্তান্তর করা হবে এবং ক্রেতা ওই দিন ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করবে।

(গ) স্বর্ণের দর বর্তমান দর থেকে কিছু কম বা বেশি ধার্য করা হবে তবে শর্ত থাকবে যে, বেচাকেনা তাৎক্ষণিক (Confermed) করে নিতে হবে। তবে মাল এক সপ্তাহের ভেতরে ক্রেতা যেকোনো দিন চাইতে পারে। এবং মাল হস্তগত হওয়া মাত্র মূল্য পরিশোধ করা হবে।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো সাধারণত মৌখিক হয়ে থাকে এবং এর ওপর কোনো সাক্ষী-প্রমাণ থাকে না। তাই উক্ত পদ্ধতিগুলোতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কেউ অস্বীকার করে অপরপক্ষ থেকে দরের ব্যবধানটার দাবিও করতে পারে, যা স্পষ্ট সুদ। উপরোক্ত পদ্ধতির লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অলংকারের পাইন ও ঝালাইসংক্রান্ত মাসায়িল :

অলংকার বানানোর জন্য স্বর্ণের ছোট ছোট টুকরা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হয়। জোড়া দেওয়ার জন্য পাইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা অত্যন্ত জরুরি।

পাইন ও ঝালাইয়ের ব্যাখ্যা :

তা এমন স্বর্ণ বা ধাতব, যা অলংকারের স্বর্ণের পূর্বেই গলে যায় এবং দুটি টুকরাকে পরস্পর জড়িয়ে দেয়। এর জন্য স্বর্ণের মধ্যে অধিক খাদ সংযুক্ত করতে হয়, যা অলংকারের মধ্যেই জোড়া দেওয়ার পরে রয়ে যায়। অথচ কারিগরদের নিকট যখন অলংকারের জন্য যাওয়া হয় তখন তারা ওই পাইন, খাদসহ অলংকারের ওজন করে দেয়। এবং এর বিনিময়ে পরিপূর্ণ স্বর্ণ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি এই থাকে যে পাইন ও খাদের বিনিময়ে স্বর্ণ-অলংকার বানানোতে কারিগরের (Wastege) ক্ষতি পূরণ হিসেবে দেওয়া হয়।

পাইন ও ঝালাইয়ের দ্বিতীয় প্রকার হলো (Cadmium), যা রুপালি রঙের রংসদৃশ ধাতু, যার সামান্য পরিমাণ স্বর্ণের সাথে মেশানো হলে প্রয়োজনমতো জোড়া লেগে যায়। তাই অলংকার বানানোর জন্য অনেকে তা ব্যবহার করে থাকেন পাইন হিসেবে। এবং কারিগরের ক্ষতিপূরণ খাতে নির্ধারিত রেটে কারিগরকে অতিরিক্ত স্বর্ণ দেওয়া হয়।

পাইনের বিনিময়ে পিওর ও খাঁটি স্বর্ণ গ্রহণ করা বৈধ। তবে উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা যায় যে, অলংকার এবং পাইনের বিনিময়ে খাঁটি স্বর্ণ সমমাপেরই নেওয়া হয় এবং মজুরি পৃথক নেওয়া হয়। যেহেতু দোকানদার কারিগরকে নিজের স্বর্ণ দিয়ে অলংকার তৈরি করাচ্ছে না। বরং কারিগরকে অলংকারের বিনিময়ে স্বর্ণ দিচ্ছে সুতরাং উক্ত অলংকার স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি। যাতে সমান সমান হওয়া এবং হাতে হাতে ক্যাশ আদান-প্রদান করা বাধ্যতামূলক। বিনিময়দ্বয়ের ওজন যেহেতু সমান সমান হবে মজুরিটা বিনিময়বিহীন হয়ে যাবে, যা প্রকারান্তরে সুদ হবে। সুতরাং এ ধরনের লেনদেন টাকার বিনিময়ে হওয়া চাই নচেৎ সুদি লেনদেন হয়ে যাবে এবং সুদের গুনাহ হবে।

যদি পাইন ও ঝালাইবিহীন অলংকার তৈরি করা যায় তা সত্ত্বেও কেউ নিজেদের স্বার্থে পাইন লাগাল তা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : স্বর্ণকার যেহেতু পাইন ও ঝালাইয়ের বিনিময়ে খাঁটি ও পিওর স্বর্ণ গ্রহণ করে থাকে। তাই যেখানে পাইন ও ঝালাইয়ের প্রয়োজন হবে ততটুকু পরিমাণ জায়েয, বৈধ। তবে যে ক্ষেত্রে পাইন ও ঝালাইয়ের বাস্তবে প্রয়োজন নেই তার পরও সে দোকানদার, গ্রাহককে পাইন লাগানোর প্রয়োজন জাহির করার মাধ্যমে ধোঁকা ও প্রতারিত করলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না।

(Westage) এটা একটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, অলংকার বানানোর প্রতিটি ধাপে স্বর্ণের ক্ষয় হয়, যা স্বর্ণের ক্ষুদ্রাণুর আকারে হয়ে থাকে যেগুলো পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করা যায় না। তাই উক্ত বাস্তবতা উপলব্ধিপূর্বক বাজারে উক্ত ক্ষয়েরও একটা নির্ধারিত মূল্য নির্ধারণ করা আছে। যথা কারিগর যদি এক তুলার অলংকার তৈরি করে দেয়, তাহলে তাকে এর ওপর এক মাশা বা এক তুলার দ্বাদশাংশ বা আট রতি অতিরিক্ত স্বর্ণ দেওয়া হয়। অথচ, অলংকার বানানোর সময় কারিগরের স্বর্ণের যে পরিমাণ ক্ষয় (Westage) হয়ে থাকে তা সম্ভাব্য তিন প্রকারের হতে পারে।

(ক) ক্ষয়ের পরিমাণ ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত পরিমাণ থেকে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। যদি অলংকার তৈরিতে তার নিকট স্বর্ণের ক্ষয় কম হয় তাহলে তার কিছু স্বর্ণ বেঁচে যায়। আর যদি ক্ষয়ের পরিমাণ অতিরিক্ত হয় তাহলে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরেও তার লোকসান রয়ে যায়। অথচ তাকে নির্ধারিত পরিমাণের ক্ষতিপূরণই কেবল দেওয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য একটা অলংকার তৈরিতে কী পরিমাণ ক্ষয় হয় তা নির্ধারণ করে কেউ বলতে পারে না।

(খ) ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত রেটে এটাও উল্লেখ থাকে যে, অনেক অলংকার তৈরিতে স্বর্ণের ক্ষয় মোটেও হয় না। তা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে থাকে।

(গ) আবার অনেক অলংকার এমনও থাকে যে যাতে ক্ষয় তো হয় বটে; কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না।

উল্লিখিত প্রকারসমূহের শরয়ী বিধান-

Westage সংক্রান্ত মাসআলা মূলত তিন প্রকার হতে পারে।

প্রথম প্রকার :

কারিগর নিজের স্বর্ণ দ্বারা অলংকার তৈরি করল এবং দোকানদারের নিকট বিক্রি করল। বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি- ১. সম্পূর্ণ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা। ২. স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা।

নিজের তৈরি অলংকার স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি :

উদাহরণস্বরূপ, কারিগর তিন তোলা অলংকার তৈরি করল, এতে আনুমানিক তিন মাশা তথা ২৪ রতি Westage দেওয়া হলো, তাহলে কারিগর তিন তোলা তিন মাশা পেল। আবার প্রতি তোলার মজুরি বাবদ ২০০ টাকা নির্ধারণ করল। তাহলে কারিগর উক্ত অলংকারের দর বলার সময় সবগুলো হিসাব করে বলবে মোট এত টাকা দিতে হবে। কারিগর দর বলার সময় Westage-এর রেট বললেও বলে দিতে পারে। তবে অলংকারের মূল্য সর্বমোট রেটের ওপর হবে।

এভাবে বিল বানাবে না যে তিন তোলা স্বর্ণের মূল্য এত। এবং Westage-এর মূল্য এত। মজুরি এত। সর্বমোট এত। কেননা হতে পারে বাস্তবে Westage তিন মাশা তথা ২৪ রতি থেকে কম হবে। তাহলে সে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে।

যদি অলংকার এমন হয়, যাতে কোনো প্রকারের ক্ষয় হয় না তবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তাহলে তিন তোলা অলংকারের মূল্য কত তা বলবে এবং এতে উক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যখন দোকানদার কারিগরকে বলে যে অমুক অলংকারটা আমাকে দেন। তাহলে কেনাবেচা কত টাকার ওপর হচ্ছে, সেটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা ভালো। যথা দোকানদার বলবে আমি এত টাকায় ক্রয় করলাম। এবং বিক্রেতা বলল আমি এত টাকায় বিক্রি করলাম।

যদি অলংকার এমন হয়, যা তৈরিতে ক্ষয় তো হয় বটে Westage দেওয়ার প্রথা থাকে না। এমতাবস্থায় সর্বমোট টাকায় যে মূল্য নির্ধারিত হবে এর বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে।

সারকথা, কারিগর যদি নিজের স্বর্ণ দ্বারা অলংকার তৈরি করে তাহলে উক্ত অলংকারকে যতটুকু এবং যেভাবে আছে এর ওপর ভিত্তি করে দোকানদারকে বিক্রি করতে পারবে।

যদি অলংকার সাদাসিধা কারুকার্যবিহীন হয় এবং Westage নির্ধারিত হয় যথা ২০ ক্যারেট তাহলে তা খাঁটি স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা যেতে পারে। তবে বিনিময়দ্বয় সমপরিমাণের এবং হাতে হাতে লেনদেন হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। বাকিও চলবে না Westage-এর নামে অতিরিক্ত স্বর্ণ ও টাকা নেওয়াও যাবে না। যদি অলংকার মণিমুক্তা খচিত হয় তাহলে অতিরিক্ত ওজনের ওপরও বিক্রি করা যাবে। তবে অলংকারে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে ওই পরিমাণ স্বর্ণের ওপর ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বে কবজ করা জরুরি।

দ্বিতীয় প্রকার :

কারিগর দোকানদারের স্বর্ণ দ্বারা অলংকার তৈরি করে দোকানদারকে সরবরাহ করল, এমতাবস্থায় যেহেতু কারিগর দোকানদারের নিযুক্ত মজদুর এবং সে নিজের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। তাই Westage-এর হিসাব করে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে Westage কে তার পারিশ্রমিকের অংশ বানানো যাবে না। কেননা পূর্বের বর্ণনা অনুসারে

Westage-এর মধ্যে কমবেশও হতে পারে। সুতরাং এর পরিমাণ অজ্ঞাত। অতঃপর দোকানদার কারিগরকে Westage-এর স্বর্ণ হেবা বা দান করবে।

তৃতীয় প্রকার :

দোকানদার কারিগরকে অলংকার তৈরির জন্য স্বর্ণ প্রদান করল এবং কারিগর নিজের স্বর্ণ দ্বারা অলংকার তৈরি করল। যেহেতু এ ধরনের প্রথাও রয়েছে, সেহেতু প্রথাও প্রচলনকে দলিল বানিয়ে মনে করা হবে যে, দোকানদার নিজের স্বর্ণ কারিগরকে ধার দিয়েছে এবং বানানো অলংকারগুলো উক্ত ধারের অংশ থেকে উসুল করেছে। এ প্রকারটাও দ্বিতীয় প্রকারের মতো হবে এবং দোকানদার Westage কারিগরকে হেবা করবে। দোকানদার যখন পরবর্তীতে গ্রাহককে বিক্রি করে তখন সেও বিস্তারিত বিলের মধ্যে Westage, মজুরি উল্লেখ করবে এবং দোকানদার যদি কারিগরকে প্রতি তোলায় এক মাশা Westage দিয়ে থাকে। গ্রাহকের কাছ থেকে সে সাড়ে এক মাশা নিয়ে নেয়, যা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। কেননা দোকানদার Westage হিসেবে গ্রাহক থেকে কেবল ওই পরিমাণ নিতে পারবে, যে পরিমাণ বাস্তবে অলংকার তৈরিতে ক্ষয় হয়েছে এবং এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তবে সে মজুরি অথবা লাভের নামে অতিরিক্ত টাকা গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে।

স্বর্ণ-রৌপ্যের লেনদেনে নব প্রচলিত কিছু পদ্ধতি :

প্রথম পদ্ধতি :

বর্তমান যুগে Forex এবং Comex-এর নামে লেনদেনকারী কিছু নতুন কোম্পানি বাজারে এসেছে। উক্ত কারবারের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমাদের সামনে এসেছে তা দ্বারা বোঝা যায় যে উক্ত কারবারসংক্রান্ত সাধারণত যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ অবৈধ।

উপর্যুক্ত ব্যবসার কর্মপদ্ধতি :

কোনো ব্যক্তি দশ হাজার ডলার উক্ত কোম্পানিতে জমা দিয়ে উক্ত স্কিমের মেম্বারশিপ নিতে পারে। এরপর কোম্পানির লোকজন তাকে দিকনির্দেশনা দেবে যে, সে কখন এবং কোন মুদ্রা বা পণ্য কিনবে, যা পরবর্তীতে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার আশা করা যায়। প্রত্যেক মুদ্রা পণ্যের ক্রয়সংক্রান্ত সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত থাকে যাকে (Lot) লট বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৬২৫০০ ব্রিটেন পাউন্ডের অথবা ১২৫০০০ জার্মানি মার্কের একটা লট হয়ে থাকে। তদ্রূপ পণ্যের মধ্যে তুলা, চিনি, গম এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের এক শ আউন্স ও পাঁচ হাজার আউন্স হয়ে থাকে। যখন আপনি উপরোল্লিখিত কোনো মুদ্রা বা পণ্যের কোনো লট কিনতে আগ্রহী হয়ে কোম্পানিকে আপনি অর্ডার দেবেন। তখন কোম্পানি আপনার জমাকৃত দশ হাজার ডলার থেকে দুই হাজার ডলার বায়নাস্বরূপ রিজার্ভ করে নেবে এবং আপনার অর্ডার হেড অফিসে পৌঁছে দেবে, যা আপনার অর্ডারকে পরিপূর্ণতাদানের মাধ্যমে লট ক্রয়ের অবগতি প্রদান করে। উক্ত ক্রয়ও দুই প্রকারের হতে পারে।

১। যাকে Cash trading অথবা Spot trading বলা হয়।

২। যাকে Future trading বলা হয়।

Cash trading-এর মধ্যে তো ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর তাৎক্ষণিক কব্জ অর্জিত হতে পারে। অথচ Future Trading-এর মধ্যে এটাই সিদ্ধান্ত হয় যে, বিক্রেতা নির্ধারিত সময়ের পরে অমুক তারিখে উক্ত লট সরবরাহ করবে। মূল্যও নির্ধারিত করা হয়ে থাকে।

উক্ত লেনদেনে কোম্পানির ভূমিকা :

এ বিষয়ে Empire resorces-এর ব্যাখ্যা।

The objects for which the company is established are as follows :

To install equipment operate and provide facilities of communication through monitors and appratice link up to as a commission house between the clients and brokerage house in the various finance trading centers of the world.

অর্থাৎ, কোম্পানি নিজেদের মক্কেল এবং বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ী সেন্টারে অবস্থিত দালালদের মধ্যে কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। যেসব ব্যবসা কোম্পানি করিয়ে থাকে তাতে কোম্পানি প্রতি ব্যবসার ওপর ৫০-৬০ ডলার কমিশন গ্রহণ করে থাকে। উক্ত ব্যবসায় মক্কেলের লাভ হোক বা লোকসান অথবা কিছুই না হোক। ক্রেতা যে লট ক্রয় করবে উক্ত লট ক্রয়ের দিন যদি বিক্রি করে দেয় তাহলে কোম্পানি শুধু এর উপর কমিশন নিয়ে থাকে। আর যদি ওই দিন বিক্রি না করে তবে কোম্পানি কমিশনের সাথে দৈনিক ৫-৬ ডলার করে সুদ গ্রহণ করে থাকে। কিছু কিছু পদ্ধতিতে মক্কেলও সুদ পেয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত লেনদেনের প্রকারদ্বয়ের ব্যাখ্যা-

১.Spot/Cash trading

কোম্পানি নিজ বর্ণনা মতে নিজের মক্কেলদের দালালদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয় এবং কমিশনের ওপর ব্যবসা করায়। উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবসা মক্কেল ও ট্রেড সেন্টারে অবস্থিত দালালদের মাঝে হয়ে থাকে। তবে মক্কেল যেহেতু সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে না। সেহেতু মুদ্রা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়ে উক্ত ব্যবসা দুই কারণে নাজায়েয ও অবৈধ।

ক. উক্ত পদ্ধতিটি بيع الدين بالدين ঋণের বিনিময়ে ঋণের ক্রয়-বিক্রয়। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের তরফ থেকে

ঋণ। কেননা উক্ত পদ্ধতিতে যেহেতু বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রিত পণ্যের ওপর কব্জা দেয়নি এবং ক্রেতা ক্রয়মূল্য আদায় করেনি। অথচ উক্ত প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয।

উদাহরণস্বরূপ-

فى الدر المختار : باع فلوسا بمثلها او بدراهم او بدنانير فان نقد احدهما جاز وان تفرقا بلا قبض احدهما لم يجز- (الدر المختار ٥/١٧٩)

অর্থাৎ, পয়সাকে পয়সার বিনিময়ে অথবা পয়সাকে দিরহামের বিনিময়ে অথবা দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করল। যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যেকোনো একপক্ষ তার অংশ আদায় করল। তাহলে বেচা-বিক্রি বৈধ। যদি উভয়ে নিজ নিজ অংশ আদায় করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়। তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা শামী (রহ.) বলেন-

لانه يكون افتراقا عن دين بدين وهو غير صحيح (رد المختار ٥/١٧٩)

অর্থাৎ সেটা হলো, ঋণের বিনিময়ে ঋণ, যা অবৈধ।

খ. ক্রেতা ক্রয়ের পর যত দিন বিক্রি করতে সময় লাগবে, তত দিন প্রতিদিনের হিসাবে কোম্পানিকে ক্রেতার সুদ দিতে হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

আর যদি কোম্পানি নিজেই লট ক্রয় করে অথবা কোম্পানির নিকট লট থাকে এরও দুটি প্রকার।

(১) উক্ত লট কোম্পানি নিজের জন্য ক্রয় করে পরবর্তীতে মক্কেলের নিকট উক্ত লট বিক্রি করে তাতে পূর্বোল্লিখিত সমস্যাদ্বয় বিদ্যমান থাকে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে কোম্পানি বিনা কারণে কমিশন গ্রহণ করে থাকে।

(২) কোম্পানি উক্ত লট মক্কেলের জন্য ক্রয় করে এবং নিজের পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধপূর্বক লটের ওপর কব্জ করে। উক্ত পদ্ধতিতে بيع الدين بالدين বা ঋণের ক্রয়-বিক্রয় ঋণের বিনিময়ে না হলেও সুদমুক্ত হচ্ছে না বিধায় তাও অবৈধ।

২। Future trading এই পদ্ধতিটা যদিও বাই ছালাম সাদৃশ্য। কিন্তু এতে বাই ছালামের অনেক শর্তের উপস্থিতি পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বাই ছালামের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মজলিশেই رأس المال তথা সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অথচ তা Future trading-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। তদ্রূপ বাই ছালামের মধ্যে ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর যতক্ষণ ক্রেতার কব্জ পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ এতে কোনো প্রকারের তাছাররুফ তথা হস্তক্ষেপ করা যাবে না। অথচ আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মূল ভিত্তিই হলো এই যে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করার নির্ধারিত তারিখ আসার পূর্বেই তা অন্যের হাতে বিক্রি করে দেওয়া যায়।

দুররুল মুখতারে উল্লেখ আছে যে,

ولا يجوز التصرف للمسلم اليه فى رأس المال ولا لرب السلم فى المسلم فيه قبل قبضه نحوبيع (الدر المختار ٥/٢١٨)

অর্থাৎ, মুসলাম ইলাইহি তথা বিক্রেতার জন্য রা'ছুল মাল তথা মূল্যের ওপর এবং রাব্বুচ্ছালাম তথা ক্রেতার জন্য মুসলামফীহি তথা ছালামকৃত পণ্যের ওপর কব্জকরণ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয়ের মতো হস্তক্ষেপ অবৈধ।

উপরোল্লিখিত সমস্যাগুলো ওই সময় হবে, যদি ক্রয়কৃত জিনিস কোনো মুদ্রা, অথবা অন্য কোনো পণ্য হয়। আর যদি ক্রয়কৃত বস্তু স্বর্ণ-রৌপ্য হয় তাহলে বাই ছালাম বৈধ হওয়ার কোনো অবকাশই থাকে না। বাই ছালাম مثمن তথা যার জন্য (ثمن) ছামান ধার্য করা যায় তার মধ্যে হতে পারে। অথচ স্বর্ণ-রৌপ্য হলো, সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত ছামান।

এ বিষয়ে 'বাদায়েউসসানায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে যে,

واما السلم فى الفلوس عدد ا فجائز عند ابى حنيفة وابى يوسف وعند محمد لا يجوز بناء على ان الفلوس اثمان عنده فلا يجوز السلم فيها كما لا يجوز السلم فى الدراهم والدنانير (بدائع الصنائع ٥/٢٨٠)

অর্থাৎ, পয়সার মধ্যে গণনার ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে বাই ছালাম বৈধ। তবে ইমাম মুহাম্মদের মতে অবৈধ। কেননা তাঁর মতে পয়সাও ছামান, দিরহাম, দিনারের মতো, দিরহাম, দিনারে যেমন বাইছালাম অবৈধ। তদ্রূপ পয়সাতে অবৈধ হবে।

প্রচলিত আরো একটা পদ্ধতি :

বর্তমান যুগে লেনদেনের আরো একটা পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। যথা–এক মাসের বাকিতে স্বর্ণের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ বিক্রয় করা। উদাহরণস্বরূপ দশ তোলা স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয় করল। ক্রেতা ক্রয়কৃত স্বর্ণের ওপর কব্জ করে না বরং মূল্য পরিশোধের সময় যখন আসে, তখন ওই দিনের স্বর্ণের বাজার মূল্য হিসাব করে। এবং ওই দিনের মূল্যও ক্রয়ের দিনের মূল্যের মধ্যে যা ব্যবধান হয়। শুধু তা পরিশোধ করে।

উদাহরণস্বরূপ- ক্রয়ের দিন স্বর্ণের মূল্য ৩০০০০ টাকা ছিল। মূল্য পরিশোধের দিন ৩১০০০ টাকা হয়ে গেল। তখন ক্রেতা বিক্রেতা থেকে প্রতি তোলা ১০০০ টাকা করে ব্যবধান হওয়া মূল্যের অংকটা নিয়ে নেবে। আর যদি মূল্য পরিশোধের দিন বাজারদর ১০০০ টাকা কমে যায়। তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রতি তোলায় ১০০০ টাকা হিসাবে পরিশোধ করবে।

উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ক্রেতা স্বর্ণের ওপর কব্জ করে না। বিক্রেতা মূল্যের ওপরও কব্জ করে না। শুধুমাত্র মূল্যের কমবেশের ব্যবধান যতটুকু হয়, তারই লেনদেন করে থাকে। লেনদেনের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও হারাম। যার ব্যাখ্যা বিগত সংখ্যার মূলনীতি নং-৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মৃত্যুর পর লাশ দাফনে বিলম্ব : ইসলাম কী বলে?

মুফতী মুহাম্মদ শফিক

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নামই নয় বরং ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। তাই একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে শৈশবকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল, মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী সময় কিভাবে কাটাবে–তার বিস্তারিত বর্ণনা ও দিকনির্দেশনা ইসলাম প্রদান করেছে। সুতরাং একজন মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর তাকে গোসল দেয়া, কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা ও কবরস্থ করার বিস্তারিত বর্ণনা ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞ আলেমগণ বলে দিয়েছেন। বিধায়, কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর তার মৃত্যু-পরবর্তী কাজগুলো ধর্মীয় বিধিবিধানের আলোকেই সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের দেশে একজন মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর থেকে নিয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত এমন কিছু প্রথা চালু আছে, যা আদৌ শরীয়তসম্মত নয়। প্রচলিত ভ্রান্ত প্রথাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রথা নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। মৃত্যুর পর লাশ দাফনে বিলম্ব করা শরীয়তসম্মত নয় :

আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে যে প্রথাটি চালু আছে তা হলো, সঙ্গত কারণ ছাড়াই অনর্থক লাশ কাফন-দাফন করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হয়। সমাজে যিনি যত বড় হয়ে থাকেন, তার লাশ কাফন-দাফনে তত বেশি বিলম্ব করা হয়। ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যদি কেউ দেশের বাইরে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের দেশে ফেরা পর্যন্ত লাশ দাফন করা হয় না। বরং মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালের হিমঘরে রেখে দেওয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় ভিসা জটিলতার কারণে আত্মীয়স্বজনদের দেশে ফিরতে দু-চার দিন বা দু-এক সপ্তাহ দেরি হয়। এত দিন পর্যন্ত লাশ কবরস্থ করা হয় না। কিন্তু লাশ কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিলম্ব করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট ভাষায় বিলম্ব করা থেকে নিষেধ করেছেন। এ-সংক্রান্ত কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো :

انّ طلحة بن البراء رضى الله عنه مرض فاتاه النبى عليه السلام يعوده فقال انى لارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنونى به وعجّلوا فانه لاينبغى لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهرانى اهله۔

অর্থ : হযরত তালহা (রা.) অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর খোঁজখবর নেয়ার জন্য তাশরীফ আনলেন। অতঃপর তাঁকে দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তো দেখছি সে মারা গেছে। তোমরা খুব দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো এবং আমাকে সংবাদ দাও। কারণ, কোনো মুসলমানের লাশ মৃত্যুর পর (দ্রুত কবরস্থ না করে) তার পরিবারের মাঝে ফেলে রাখা ঠিক নয়। (আবু দাউদ শরীফ, খ : ২, পৃ : ৪৫০)

عن علىى بن ابى طالب رضى الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا على ثلاث لاتؤخرها الصلوة اذا انت والجنازة اذا حضرت والايّم اذا وجدت لها كفوًا۔

অর্থ: হযরত আলী (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আলী! ৩টি কাজের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না। ১. নামাযের যখন সময় আসবে, তখন নামায আদায় করা থেকে দেরি করবে না। ২. মৃত ব্যক্তির জানাযা যখন উপস্থিত হবে, তখন কাফন-দাফন সম্পন্ন করতে দেরি করবে না। ৩. কোনো অবিবাহিতা মেয়ের জন্য যখন কোনো উপযুক্ত পাত্র পাবে, তখন তাকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না।' (তিরমিযী শরীফ, খ : ১, পৃ : ২০৬)

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى عليه السلام قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدموها وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم۔

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার খাটিয়া নিয়ে দ্রুতবেগে যাও (কবরস্থ করার জন্য)। কারণ, মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয় তাহলে তো তোমরা তাঁকে কল্যাণের নিকটবর্তী করে দিলে, আর যদি সে নেক্কার না হয় তাহলে এক অকল্যাণকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। (বুখারী শরীফ, খ : ১, পৃ : ১৭৬)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه و اسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة۔

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তখন তাকে তোমাদের মাঝে আটকে রেখো না বরং তোমরা তাকে অতি দ্রুত কবরস্থ করার জন্য কবরের দিকে নিয়ে যাও এবং তার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম অংশ এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে

সূরা বাকারার শেষের অংশ পাঠ করো। (বাইহাকী শরীফ, মিশকাত শরীফ, খ : ১, পৃ : ১৪৯)

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোর আলোকে বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন ও জানাযার নামায পড়ানো এবং কবর খনন করার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন, এর চেয়ে বেশি বিলম্ব করা সমীচীন নয়। বরং এ কাজগুলো দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে খুব তাড়াতাড়ি তাকে কবরস্থ করতে হবে। সুতরাং আমাদের দেশে যে সমস্ত কারণে লাশ দাফনে বিলম্ব করা হয় যেমন : ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন দেশে ফেরার অপেক্ষা করা বা লোক সমাগম বেশি হওয়ার আশায় বিলম্ব করা ইত্যাদি কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে দেরি করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। সুতরাং তা অবশ্যই বর্জনীয়।

এ ব্যাপারে ইসলামী জগতের বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থসমূহ থেকে কিছু দলিল-প্রমাণ পেশ করা হলো।

বিখ্যাত ফিকহগ্রন্থ 'তানভীরুল আবসার-এ উল্লেখ আছে,

وكره تاخير صلاته ودفنه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلوة الجمعة ـ

অর্থ : জুম'আর পর জানাযা পড়ালে লোক সমাগম বেশি হবে এই জন্য মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায ও দাফনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা মাকরূহ তথা অপছন্দনীয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী মাআ-আদ্দুর, খ : ২, পৃ : ২৩২)

বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া'তে উল্লেখ আছে,

میت کو محض اس خیال سے کہ جمعہ کے بعد جنازہ پڑھا جائے تو ثواب زیادہ ہوگا اتنی دیر تک روکے رکھنا مکروہ ہے مستحب اور افضل یہ ہے کہ اسکے دفن میں جلدی کی جائے، اگر ایسے وقت انتقال ہوا ہے کہ اسکے دفن کرنے میں جمعہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر نماز جمعہ تک مؤخر کرے ۔

অর্থ : জুম'আর নামাযের পর লোক সমাগম বেশি হবে এবং সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে এ ধারণা করে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায জুম'আর নামায পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ তথা অপছন্দনীয়। বরং উত্তম হলো, তার কাফন-দাফন দ্রুত সম্পন্ন করা। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি এমন সময় মারা গিয়ে থাকে যে, জুম'আর আগেই তাকে কাফন-দাফন করলে জুম'আর নামায না পাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাহলে এমতাবস্থায় (জানাযার নামায ও দাফন) জুম'আ পর্যন্ত বিলম্ব করবে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, খ : ৩, পৃ : ২০২)

২। সঙ্গত কারণ ছাড়া একাধিক জানাযার নামায শরীয়তসম্মত নয় :

আমাদের দেশে আরেকটি বিষয়ও ব্যাপক হারে প্রচলন শুরু হয়েছে তা হলো, একই মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায একাধিকবার পড়া। সমাজে যিনি যত বড় ব্যক্তি তাঁর জানাযার নামায তত বেশিবার পড়া হচ্ছে। প্রথম জানাযা সংসদ ভবনের সামনে, দ্বিতীয় জানাযা জাতীয় মসজিদের সামনে, তৃতীয় জানাযা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে, চতুর্থ জানাযা তাঁর গ্রামের বাড়িতে। এভাবে তিন-চারবার না হলেও দু'বার পড়া হচ্ছে। একবার তার কর্মস্থলে, দ্বিতীয়বার তার নিজ বাড়িতে। অথচ একাধিকবার জানাযার নামায শরীয়তসম্মত নয়। শুধুমাত্র একটি কারণে কারো জানাযা নামায একাধিকবার পড়ানোর অনুমতি আছে। তা হলো, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিরা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া জানাযার নামায একবার আদায় করে তাহলে এমতাবস্থায় অভিভাবক চাইলে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়তে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রথম জানাযায় যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা দ্বিতীয় জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আর যদি কোনো মৃত ব্যক্তির কোনো অভিভাবক জানাযার নামায একবার আদায় করে অথবা তার অনুমতিক্রমে অন্যরা একবার জানাযার নামায আদায় করে নেয়, তাহলে অভিভাবক বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয়বার জানাযার নামায আদায় করার অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীস উল্লেখ আছে। যেমন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر رضى الله عنه ومعه قوم فاراد ان يصلى ثانيا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم الصلوة على الجنازة لاتعاد ولكن ادع للميت واستغفرله

অর্থ: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তির জানাযার নামায থেকে যখন ফারেগ হলেন, তখন হযরত ওমর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গে আরও কিছু সাহাবীগণ উক্ত মৃত সাহাবীর দ্বিতীয় জানাযার নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে বললেন, মৃত ব্যক্তির ওপর জানাযার নামায বারবার পড়া যায় না। বরং তোমরা তার জন্য দু'আ করো এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। (বাদায়েউস সানায়ে, খ : ২, প : ৩৩৭)

এ ব্যাপারে বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'তে উল্লেখ আছে,

ولا يصلى على الميت الا مرة واحدة والتنفل بصلوة الجنازة غير مشروع ـ

অর্থ : মৃত ব্যক্তির ওপর জানাযার নামায (ফরজে কিফায়াহ হিসেবে) একবারই পড়া যায়। নফল হিসেবে (দ্বিতীয়বার) জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খ : ১, পৃ : ১৬৩)

বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ 'বাদায়েউস সানায়েহ'তে উল্লেখ আছে,

ولا يصلى على الميت الا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا الا ان يكون الذين صلوا عليها اجانب بغير امر الاولياء ثم حضر الولى فحينئذ له ان يعيدها ـ

অর্থ : মৃত ব্যক্তির ওপর জানাযার নামায একবারই পড়া যায়। একাধিকবার জানাযার নামায বৈধ নয়। দলবদ্ধ হয়েও নয়, একাকীও নয়। তবে হ্যাঁ, যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্যরা একবার জানাযা পড়ে নেয় অতঃপর অভিভাবক উপস্থিত হয় তাহলে সে চাইলে দ্বিতীয়বার জানাযা নামায পড়তে পারে। (বাদায়েউস সানায়ে, খ : ২, প : ৩৩৭)

বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ 'আল-হিদায়াহ'তে উল্লেখ রয়েছে :

وان صلى الولى لم يجز لاحد ان يصلى بعده لان الفرض يتادى بالاول والنفل بها غير مشروع ولذا رأينا الناس تركوا عن اخرهم الصلوة على قبر النبى عليه السلام وهو اليوم كما وضع ـ

অর্থ : মৃত ব্যক্তির ওলী তথা অভিভাবক যদি জানাযার নামায পড়ে নেয় তাহলে অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায দ্বিতীয়বার পড়া বৈধ নয়। কারণ, জানাযার নামাযের ফরজ তো প্রথমবার পড়ার দ্বারাই আদায় হয়ে গেছে। নফল হিসেবে জানাযার নামায দ্বিতীয়বার পড়া বৈধ নয়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম উম্মাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের ওপর জানাযার নামায পড়াকে ছেড়ে দিয়েছেন অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজও কবরের মধ্যে সে অবস্থাতেই আছেন যেমন তাঁকে রাখা হয়েছিল। (আল হিদায়াহ, খ : ১, পৃ : ১৮০)

বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ আদ্দুররুল মুখতারে উল্লেখ আছে,

فان صلى غيره اى الولى (ممن ليس له حق التقدم) على الولى (ولم يتابعه) الولى (اعاد الولى) ولو على قبره ان شاء لاجل حقه لا لاسقاط الفرض ولذا قلنا ليس لمن صلى عليها ان يعيد مع الولى لان تكرارها غير مشروع ـ

অর্থ : যদি মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায অভিভাবক ব্যতীত অন্যরা পড়ে নেয় তাহলে অভিভাবক চাইলে পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারবে। যদিও মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর হোক না কেন। ইহা অভিভাবকের অধিকার। যদিও প্রথমবার জানাযা পড়ানোর দ্বারাই ফরজ আদায় হয়ে গেছে। তবে দ্বিতীয়বার জানাযা শুধু অভিভাবকরাই পড়তে পারবে। এ জন্যই আমরা বলি যে, যারা প্রথমবার জানাযায় শরীক হয়েছে তারা অভিভাবকের সাথে দ্বিতীয় জানাযায় শরীক হতে পারবে না। কারণ, বারবার জানাযার নামায বৈধ নয়।

(শামী মাআ-আদ্দুর, খ : ২, পৃ : ২২২)

বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া'তে উল্লেখ আছে,

ایک دفعہ میت کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے لہذا اگر میت کی ولی یا قاضی نے اصالہ یا نیابہ نماز جنازہ ایک دفعہ ادا کی تو دو بارہ یا متعدد بار جنازہ پڑھنا غیر مشروع ہے

অর্থ : একবার মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া ফরজে কেফায়াহ। সুতরাং যদি মৃত ব্যক্তির অভিভাবক অথবা প্রশাসক সরাসরি অথবা তাদের অনুমতিতে একবার জানাযার নামায আদায় হয়ে যায়। তাহলে দ্বিতীয়বার অথবা বারবার জানাযা পড়া বৈধ নয়। (ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া, খ : ৩, পৃ : ৪৪৩)

৩। বিনা প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির লাশ এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করা সঠিক নয় :

আমাদের দেশে বর্তমানে আরেকটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর প্রয়োজন ছাড়াই এক শহর থেকে অন্য শহরে লাশ স্থানান্তর করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি ঢাকাতে পরিবার নিয়ে বসবাস করে এবং সেখানেই মারা যায়। কিন্তু মৃত্যুর পর তার লাশ জন্মস্থান যেমন বগুড়া অথবা রাজশাহীতে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাফন করা হয়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মোটেও সমীচীন নয়। বরং বিখ্যাত কিছু ফতওয়াগ্রন্থে এ ধরনের স্থানান্তরকে মাকরূহে তাহ্‌রিমী বলা হয়েছে। কেননা, হাদীস শরীফে এক শহর হতে অন্য শহরে লাশ স্থানান্তর করা নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ রয়েছে,

عن جابر رضى الله عنه قال كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم فجاء منادى النبى ﷺ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تدفنوا القتلى فى مضاجعهم فرددناهم ـ

অর্থ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওহুদের যুদ্ধে আমাদের পরিচিত শহীদদের লাশ ওহুদ প্রান্তর থেকে স্থানান্তর করে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী এলেন এবং আমাদের বললেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের স্বজনদের লাশ ওহুদ প্রান্তরেই শহীদ হওয়ার স্থানে দাফন করো। এ নির্দেশের পর আমরা তাঁদেরকে ওহুদ প্রান্তরেই দাফন করলাম। (আবু দাউদ শরীফ, খ : ২, প : ৪৫১)

উক্ত হাদীসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ওহুদ একটি খোলা প্রান্তর। যেখানে কোনো বসতি নেই। বিধায় সঙ্গত কারণেই সাহাবায়ে কেরামগণ শহীদদের লাশ মদীনায় ফিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের নির্দেশ দিলেন যে, যেখানে মৃত্যু হয়েছে, সেখানেই দাফন করতে হবে। তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে,

عن عبد الله بن مليكة قال توفى عبد الرحمن بن ابى بكر بالحبشى قال فحمل الى مكة فدُفن فيها فلما قدمت عائشة اتت قبر عبد الرحمن بن ابى بكر فقالت وكنا كندمان جزيمة .....ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت الا

حيث متَّ ولو شهدتك مازرتك।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুলাইকা থেকে বর্ণিত। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (হযরত আয়েশা (রা.)-এর আপন ভাই) যখন মক্কার নিকটবর্তী স্থান হুবশীতে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর লাশ সেখান থেকে মক্কা শরীফে স্থানান্তর করা হয়। এবং মক্কাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। (হযরত আয়েশা (রা.) ভাইয়ের মৃত্যুর সময় সফরে ছিলেন।) তিনি যখন সফর থেকে ফিরে এলেন, তখন ভাইয়ের কবরের পাশে এলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যথিত হৃদয়ে দুটি কবিতার শ্লোক আবৃতি করলেন এবং শেষে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি তোমার মৃত্যুর সময় তোমার কাছে থাকতাম, তাহলে অবশ্যই তোমার দাফন সেখানেই হতো, যেখানে তোমার মৃত্যু হয়েছে। (তিরমিযী শরীফ, খ : ১, পৃ : ২০৩)

এ ধরনের আরও কিছু হাদীসের কারণে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যেখানে মারা যাবে, সেখানেই অথবা তার আশপাশে তাকে দাফন করতে হবে। বিনা কারণে লাশ এক শহর থেকে দূরবর্তী অন্য শহরে স্থানান্তর করা যাবে না। কারণ প্রথমত, লাশ স্থানান্তর করা হাদীসে নিষেধ আছে। দ্বিতীয়ত, লাশ স্থানান্তর করার দ্বারা দাফন করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হবে এবং লাশ অন্য স্থানে নিয়ে গেলে সেখানকার আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পুনরায় পড়বে। অথচ এ দুটি জিনিসই হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এ ব্যাপারে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামগণের কিছু মতামত তুলে ধরছি। বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ 'বাহরুর রায়েক'-এ উল্লেখ আছে,

اذا مات فى بلده يكره نقله الى اخرى لانه اشتغال بمالايفيد وفيه تاخير دفنه।

অর্থ : কোনো ব্যক্তি যখন তার নিজ শহরে মারা যাবে, তখন তাকে সেখান থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহ। কারণ এটা একটি অনর্থক ও বেফায়দা কাজ এবং এ কাজের জন্য তার দাফনে বিলম্ব হবে। (আল বাহরুর রায়েক, খ : ২, পৃ : ১৯৫)

বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ 'আহসানুল ফাতাওয়া'তে উল্লেখ আছে,

میت کو دوسرے شہر کی طرف نقل کرنا مکروہ تحریمی ہے

অর্থ : মৃত ব্যক্তিকে (যেখানে মারা গেছে সেখান থেকে) অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহে তাহরীমী। (আহসানুল ফাতাওয়া, খ : ৪, পৃ : ২১৮) তবে মারা যাওয়ার স্থান থেকে পার্শ্ববর্তী দু-চার মাইলের মধ্যে স্থানান্তর করার অনুমতি আছে।

৪। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে গায়েবানা জানাযা বৈধ নয় :

আমাদের সমাজে একটি বিষয়ের মারাত্মক প্রচলন আছে। তা হলো, কোনো কোনো সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাযা পড়ানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে দেখা যায় যে, কোনো রাজনৈতিক কর্মী যখন নিজ দলের কোনো প্রোগ্রামে মারা যায়, তখন দেশব্যাপী তার দলীয় নেতা-কর্মীরা গায়েবানা জানাযা আদায় করে। অথচ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে জানাযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তাবলি রয়েছে তন্মধ্যে একটি অন্যতম শর্ত হলো, ইমাম সাহেবের সামনে লাশ উপস্থিত থাকতে হবে। অতএব যেহেতু গায়েবানা জানাযায় লাশ অনুপস্থিত থাকে, তাই গায়েবানা জানাযা নামায বৈধ নয়। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে,

ومن الشروط حضور الميت ووضعه وكونه امام المصلى فلا تصح على غائب।

অর্থ : জানাযার নামায বৈধ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে একটি অন্যতম শর্ত হলো, মৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত থাকা এবং লাশকে মুসল্লিদের সামনে রাখা। সুতরাং গায়েবানা জানাযার নামাযে এই শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে তা বৈধ নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খ : ১ পৃ: ১৬৪)

প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ 'আদ্দুর রুল মুখতার-এ উল্লেখ আছে,

وشرطها ايضًا حضوره ووضعه وكونه هو او اكثره امام المصلى وكونه للقبلة فلا تصح على غائب।

অর্থ : জানাযার নামায সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে অন্যতম শর্ত হলো, মৃত ব্যক্তির উপস্থিতি এবং তার পুরো শরীর অথবা শরীরের অধিকাংশ মুসল্লিদের সামনে থাকা এবং কিবলার দিকে থাকা। সুতরাং (উক্ত শর্ত না পাওয়ার কারণে) গায়েবানা জানাযা সহীহ নয়। (শামী মাআ-আদ্দুর, খ : ২, পৃ : ২০৮)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় মদীনার বাইরে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেসব যুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক প্রিয় সাহাবীগণ শহীদ হয়েছিলেন। মদীনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যখন সেসব প্রিয় সাহাবীর শাহাদতের খবর পৌঁছে, তখন তিনি কোনো সাহাবীর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েননি। অথচ সমস্ত সাহাবীর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁদের আত্মীয়স্বজন মারা গেলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেন জানাযার নামায পড়ান। কারণ, কোনো মৃত ব্যক্তির ওপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জানাযার নামায পড়ানো তার জন্য বিরাট বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে,

لايموتن احدمنكم الا اذنتونى به فان صلاتى عليه رحمة له।

অর্থ : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে অবশ্যই আমাকে সংবাদ দেবে। কারণ আমি যদি তার জানাযার নামায পড়াই তাহলে এ জানাযার নামায তার জন্য রহমত হবে। (ফতওয়ায়ে শামী, খ : ২, পৃ : ২০৯)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শত শত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে; সে সমস্ত যুদ্ধে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন। অথচ হাদীসের কোনো গ্রন্থে উল্লেখ নেই যে, চার খলীফার কেউ তাঁদের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বা অন্য কোনো সাহাবী সে সমস্ত শহীদ সাহাবীদের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। তাহলে যদি গায়েবানা জানাযা বৈধ হতো বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়েছেন বলে সাহাবীগণের জানা থাকত তাহলে পরবর্তীতে অবশ্যই গায়েবানা জানাযার নামায পড়ানোর প্রচলন থাকত।

তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুজন ব্যক্তির ওপর গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছেন, যা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একজন হলো, আবিসিনিয়ার বাদশাহ হযরত নাজ্জাশী এবং অন্যজন হলেন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে মুআযা মাজানী (রা.)-এর জন্য। সে হাদীসের ভিত্তিতে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) গায়েবানা জানাযা বৈধ বলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের একাধিক উত্তর দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, উক্ত জানাযার নামায মূলত গায়েবানা জানাযা ছিল না। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে লাশকে উপস্থিত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং লাশের সামনেই তিনি জানাযার নামায পড়েছিলেন। যেমনটি সহীহ ইবনে হিব্বান কিতাবে উল্লেখ আছে,

وفى صحيح ابن حبان عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال انبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشى توفى فقوموا فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه وكبّر اربعًا وهم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه-

অর্থ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের খবর দিলেন যে, তোমাদের ভাই (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী মারা গেছেন সুতরাং তোমরা দণ্ডায়মান হও এবং তার উপরে জানাযার নামায পড়ো। অতঃপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়ালেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চার তাকবীর দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মনে করছিলেন যে, অবশ্যই তার (হযরত নাজ্জাশীর) লাশ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে আছে। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খ : ৭, প : ৩৬৯)

তিরমিযী শরীফে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে,

عن ابن عباس رضى الله عنه قال كشف للنبى صلى الله عليه وسلم سرير النجاشى حتى راى وصلى عليه-

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য (মু'জিযাস্বরূপ) নাজ্জাশীর লাশের খাটলিকে উন্মোচিত করা হয়েছিল। ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দেখেছেন এবং তার ওপর জানাযার নামায পড়েছেন। (তিরমিযী শরীফের টিকা, খ : ১, পৃ : ২০১)

উল্লিখিত দুটি হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত নাজ্জাশীর জানাযার নামায মূলত গায়েবানা ছিল না বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযাস্বরূপ তার লাশকে সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাশ দেখে জানাযার নামায পড়েছেন। আর যদি এ কথা মেনেও নেয়া হয় যে, হযরত নাজ্জাশী ও মু'আবিয়া মুজানী (রা.)-এর জানাযা গায়েবানা ছিল, তাহলে আমরা বলব যে, উক্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা দুটি শুধু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খুছুছিয়্যাত বা বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন, চারের অধিক বিবাহ করা, তাহাজ্জুদের নামায ফরজ হওয়া ইত্যাদি বিধানগুলো তাঁর একক বৈশিষ্ট্য ছিল। বিধায় উক্ত দুটি ঘটনাকে অনুসরণীয় বিধান মনে করে তার ওপর আমল করা বৈধ হবে না। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর শত শত সাহাবী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়েছেন কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্ত দুটি ঘটনাকে দলিল হিসেবে পেশ করে শহীদ সাহাবীগণের গায়েবানা জানাযার নামায পড়েননি।

দ্বীনদার মুসলমানদের করণীয় :

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বীনদার মুসলমানদের উচিত হবে, মৃত্যুর পূর্বেই আত্মীয়স্বজনদেরকে ওসিয়ত করা যে, আমার মৃত্যুর পর দ্রুত কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে এবং একাধিক জানাযার নামায পড়াবে না। বিশেষ করে সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ তথা হক্কানী ওলামায়ে কেরামদের জন্য উক্ত বিষয়টি বেশি জরুরি। কারণ কোনো আলেমের মৃত্যুর পর যদি অহেতুক লাশ দাফনে বিলম্ব করা হয় বা একাধিক জানাযা অথবা লাশ স্থানান্তর করা হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানগণ উক্ত বিষয়গুলোকে শরীয়তসম্মত বলে বিবেচনা করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং তার ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৮

তাকলীদ :

লা-মাযহাবী এবং আমাদের মাঝে মৌলিক মতভেদ হচ্ছে তাকলীদ নিয়ে। লা-মাযহাবীরা তাকলীদকে সরাসরি শিরক আখ্যায়িত করে থাকে। শিরক বলতে شرك فى الرسالة (শিরক ফির রিসালা)। তাদের ভাষ্য হচ্ছে, ধরিত্রীতে অনুসরণীয় ব্যক্তি হচ্ছেন একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাকে ছাড়া আর কাউকে অনুসরণ করা যাবে না। যদি অন্য কাউকে অনুসরণ করা হয়, তাহলে এটা হবে শিরক ফির রিসালা তথা রাসূলের নবুওয়াতে শিরক।

গোড়ায় গলদ :

প্রথম কথা হচ্ছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কাউকে অনুসরণ করা যাবে না। এই কথাটির কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, এমন কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করা যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পথে নিজেও চলে এবং অন্যকেও চলতে উদ্বুদ্ধ করে, মূলত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেই অনুসরণ করা।

তাদের এবং আমাদের মধ্যকার মতভেদের একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে, সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাকলীদকে মুস্তাহাব, ওয়াজিব, ওয়াজিব লি-গায়রিহী পর্যন্ত বলেছেন। এর ওপরে কেউ যাননি। অন্যদিকে লা-মাযহাবীরা তাকলীদকে সম্পূর্ণরূপে শিরক আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর তাবৎ মাযহাবপন্থী মুশরিক (সম্পূর্ণ ইসলামবহির্ভূত)। আমাদের সুবিধা হলো, লা-মাযহাবীদের অন্তঃসারশূন্য দাবির বিপক্ষে আমাদের খুব বেশি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিষয়াদির অবতারণা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাদের অবান্তর দাবির অসাড়তা বুঝতে বৈদগ্ধ্যময় হাদীসবেত্তা হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সামান্য সুস্থ মস্তিষ্ক থাকলেই তাদের ভুল-ত্রুটির নাঁড়ি-নক্ষত্র আপনাতেই প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

সহজ উদাহরণ :

এটা পৃথিবীর চিরায়ত একটা নিয়ম যে, মানুষ যখন কোনো বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়, বিষয়টা ইহলৌকিক হোক, কিংবা পারলৌকিক, তখন সে পঙ্গপালের মতো ওই বিষয়ের শাস্ত্রজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের কাছ থেকে ওই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে উদয়াস্ত সে কী অনির্বচনীয় প্রচেষ্টা, নিরন্তর অধ্যবসায়! এটা তো সবার জানাশোনা কথা! এটা কেন হয়? কারণ, কোনো বিষয়ে পারদর্শী হতে চাইলে ওই বিষয়ের ঝানু ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এ এক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

এখন কোনো অর্বাচীন যদি প্রগলভতা করে বলে, আমি কারো অনুসরণ করা ব্যতিরেকে ইহকালীন জীবনে সফলতার শীর্ষাসনে সমাসীন হব, কিংবা পরকালীন জীবনকে দীপান্বিত করব, তার এই বক্তব্যটি অসম্ভবই শুধু নয়। বরং তার বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়কও বটে। কেউ যদি আরো একধাপ এগিয়ে যায় এবং সব বাধা-বিপত্তিকে থোড়াই কেয়ার করে জীবনের তরীকে অনিশ্চিত গন্তব্যের অকুল পাথারে ভাসিয়ে দেয়, তাহলে আমি নিশ্চিত গ্যারান্টি দিতে পারি যে, কয়েক দিন পরেই তার জীবনের চাকা বৈকল্যের নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়বে। অবশেষে রণে ভঙ্গ দেয়া ব্যতীত তার সামনে কোনো বিকল্পই থাকবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের হতচ্ছাড়াদের হাপিত্যেশের ঘটনা ভূরিভূরি। তাই পৃথিবীর এই শ্বাপদসমাকীর্ণ রাস্তায় অভিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরাই শেষ এবং চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল। তাকলীদের সারনির্যাস হচ্ছেই এটা। তাই জ্ঞান-প্রজ্ঞায় যারা পৃথিবীকে দীপিত করেছেন, তাদেরকেই আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি। দলিল-প্রমাণের পিছে পড়ে খুব একটা সময় নষ্ট করতে আমরা প্রত্যয়ী নয়। কিন্তু তার পরও অশান্ত চিত্তের প্রশান্তির জন্য কিছু দলিল-প্রমাণাদি আমরা নিম্নে উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব। কোন দলিলের ভিত্তিতে আমরা তাকলীদের প্রবক্তা? তা নিম্নে আলোকপাত করা হবে।

লক্ষ করুন :

এখানে তাকলীদ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য তাকলীদে শাখছী। তথা ব্যক্তিবিশেষের তাকলীদ। কারণ, শুধুমাত্র তাকলীদের কোনো অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। যেমন মানতিকের (তর্ক-শাস্ত্র) পরিভাষায় বলা হয়, انسان তথা মানুষের কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। বরং যায়দ, বকর, আমরের মধ্যেই انسان এর অস্তিত্ব। এখানেও তদ্রূপ শুধুমাত্র তাকলীদের কোনো স্বতন্ত্র

অস্তিত্ব নেই। বরং তাকলীদের অস্তিত্ব হচ্ছে তার বিশেষ এক প্রকার তাকলীদে শাখছীর মাধ্যমেই। তাই যেসব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শুধুমাত্র তাকলীদ প্রমাণিত হয়, হুবহু একই প্রমাণাদির আলোকে তাকলীদে শাখছীও প্রমাণিত হয়ে যাবে। লা-মাযহাবীরা তাকলীদে শাখছীকে যেমন শিরক আখ্যা দিয়ে থাকে, তেমনি শুধু তাকলীদকেও শিরক সাব্যস্ত করে থাকে। আমার সামনের আলোচনায় দলিল-প্রমাণের পাশাপাশি এ কথাও সমানভাবে বিবৃত হবে যে, কোনো মানুষের জন্য তাকলীদ বর্জন করে দ্বীনের ওপর চলা আসলেই কি বাস্তবতার নিরিখে সম্ভব? না এসবের পেছনে কোনো অশুভ চক্রের হীন স্বার্থসিদ্ধির ভয়াল নীলনকশা কাজ করছে? বর্তমানের লা-মাযহাবীরা আমাদের সম্পর্কে যে ভয়ংকর আক্বীদা পোষণ করে, তার সাথে তাদের স্বীকৃত পূর্ববর্তী পুরোধারাও কি একমত ছিলেন? কিংবা তাদের কাছেও কি তাকলীদ শিরক ফির রেসালা হিসেবে পরিগণিত হতো? এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তুলে আনতে চেষ্টা করব আমার সামনের বয়ানে।

কোন তাকলীদ নন্দিত আর কোন তাকলীদ নিন্দিত?

আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি, বৈধ জিনিসের তাকলীদ করাও বৈধ। আর হারাম জিনিসের তাকলীদ করাও হারাম। যেমন, ছাগী হালাল। বিধায় তার দুধও হালাল এবং পবিত্র। আর কুত্তি (মাদী কুকুর) হারাম। বিধায় তার দুধও হারাম এবং অপবিত্র। লা-মাযহাবীরা তাকলীদের বিরুদ্ধে যেসব আয়াত এবং হাদীস শরীফ উপস্থাপন করে থাকে, সেগুলো স্পষ্টতই বর্ণিত হয়েছে ইয়াহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে। যারা ইয়াহুদী-নাসারাদের কৃষ্টি-কালচারকে সভ্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত মাপকাঠি জ্ঞান করে এর অনুসরণ অহোরাত্রি ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাদের প্রতিই চরম হুঁশিয়ারিবাণী অনুরণিত হয়েছে ওই সব আয়াতে। অবতীর্ণ হয়েছে কাদের বিরুদ্ধে, আর অভিযুক্ত করা হচ্ছে কাদেরকে? কুরআনের অর্থ বিকৃতির চেয়ে বড় জালিয়াতি আর কী হতে পারে? ওই সব আয়াতে এটাই বলা হয়েছে, ইয়াহুদী-নাসারারা যেহেতু ভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত এবং অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত, তাই তাদের তাকলীদও পথভ্রষ্টতার দিকেই নিয়ে যাবে। এটা তো স্বাভাবিক কথা। কুরআন শরীফে যে তাকলীদের বিষোদগার এবং নিন্দা করা হয়েছে, তা এটাই। যেমন ধরুন, একটি আয়াতে বলা হয়েছে–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ : তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (ইয়াহুদী ধর্মগুরু) এবং রাহিব (খ্রিস্টান বৈরাগী)-কে খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোনো প্রভু নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। (সূরা তাওবা, আয়াত -৩১)

দেখুন, উম্মতে মুহাম্মদী নিজেদের বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে আলেম অভিধায় ভূষিত করে তাকে। আহবার এবং রাহিব নামে তাদেরকে ডাকা হয় না। তাহলে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, এই আয়াতে ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে। এর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ, পরবর্তীতে ঈসা (আ.)-এর কথা আলোচনা। এত জ্বাজল্যমান এবং অকাট্য প্রমাণাদি সত্ত্বেও এই আয়াতকে মুকাল্লিদদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চূড়ান্ত দ্বেষ্টা এবং হিংসুক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

নির্জলা একটি সত্য কথা :

কুরআন-হাদীসের শব্দ এবং অর্থের যথেচ্ছ বিকৃতি লা-মাযহাবীদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কোনো আয়াত অথবা হাদীস যদি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, ওই আয়াত এবং হাদীসের ছেঁড়াখোঁড়া করতে তাদের যে অপরিমেয় আনন্দ-উল্লাস পরিলক্ষিত হয়, তা দেখলে তাদেরকে মুসলমান জ্ঞান করাটা রীতিমতো কষ্টের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এখানেও তথৈবচ। ইয়াহুদী-নাসারাদের কুফর এবং শিরকের তাকলীদকে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈধ এবং পছন্দনীয় তাকলীদের সাথে ঘুলিয়ে এক হ-য-ব-র-ল অবস্থার অবতারণা করেছে, ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতেও তারা অত্যন্ত পটিয়স বটে! তাদের যদি বাস্তবে কোনো দুরভিসন্ধি না থাকত, সত্যিকারার্থেই যদি তারা উম্মাহর শ্রেয়োবোধের প্রত্যাশী হতো, তাহলে তাকলীদের প্রকৃত অর্থ কী? তা আমাদেরকেই জিজ্ঞাসা করত। কারণ, صاحب البيت ادرى بما فيه বাড়ির কর্তাই বলতে পারে, তার বাড়িতে কী ফ্যাসিলিটি রয়েছে? আমরা কার তাকলীদ করি? কেন করি? কিভাবে করি? তা সবিস্তারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করত?

আমরা কেন তাকলীদ করি?

আমরা সাহাবায়ে কেরাম (রা.), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন কিংবা মুজতাহিদ ইমামদের শুধুমাত্র এই জন্যই তাকলীদ করি, যেহেতু তাঁদের তাকলীদ করা ব্যতিরেকে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাহিদার ওপর আমল করা সম্ভবপর হবে না। এখানে স্মরণ রাখা ভালো যে, আমরা জনসাধারণকে বোঝানোর

সহজার্থে বলে থাকি, তাকলীদ করা ব্যতীত দ্বীনের ওপর চলা অসম্ভব। কিন্তু ওলামায়ে কেরামের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, نصوص قطعيه তথা কুরআন-হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয়ে তাকলীদের কোনো অবকাশ নেই। তাকলীদ শুধুমাত্র اجتهادى مسائل তথা ইজতিহাদি বিষয়াদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, তাকলীদ করা হবে শুধু দুটি ক্ষেত্রে–

(১) যখন কোনো শব্দের একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে, তখন কোন অর্থটি নেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত হবে, সে বিষয়ে তাকলীদ।

(২) যখান কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীসের মাঝে বাহ্যত বিরোধ এবং সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হবে, তখন বাহ্যত বিরোধ নিরসনে কোনো ইমামের তাকলীদ করা।

نص قطعى (অকাট্য বিষয়), আকায়েদ, তাওহীদের ক্ষেত্রে তাকলীদের কোনো অবকাশ নেই। এর কোনো প্রয়োজনও নেই। যেমন–দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, যাকাত প্রদান করা ফরয, হজ করা ফরয, এই সব বিষয়ে তাকলীদের কোনো প্রয়োজন নেই। ইজতিহাদী বিষয়াদির ক্ষেত্রে, কিংবা বাহ্যত বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে কিংবা একাধিক অর্থবোধক শব্দের সঠিক অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে আমরা মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করে থাকি এই কারণে যে, এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে আমাদের দুর্বল জ্ঞানের ওপর নির্ভর করার চেয়ে যুগের ওই সব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনুসরণ করাই অধিক শ্রেয় এবং নিরাপদ। কারণ তাদের উচ্চ মূল্যবোধ, প্রখর ধীশক্তি, দ্বীনের ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা, খোদাভীতি এবং প্রচণ্ড উদ্ভাবনী শক্তি ছিল কিংবদন্তিতুল্য। আর আমাদের কথা যতই কম বলা যায়, ততই মঙ্গল। আমাদের সব কিছুতে মারাত্মক ধস নেমেছে। এসব কারণে আমরা তাদের অনুসরণকে শ্রেয়তর মনে করি। পূর্বের কথায় ফিরে আসি, আমরা যদিও জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য বলে থাকি, তাকলীদ করা ব্যতীত তোমাদের দ্বীনের গাড়ি বিকল হয়ে পড়বে। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম অবশ্যই জানেন যে, তাকলীদ হয় শুধুমাত্র مجتهد فيه مسائل তথা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে।

ইজতিহাদী মাসায়েলের সংখ্যা কত?

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রায় আশি ভাগ মাসআলা منصوص عليه তথা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত। আর মাত্র বিশ ভাগ মাসআলা مجتهد فيه তথা ইজতিহাদী। আর আমাদের প্রতিপক্ষ সুহৃদদের অহর্নিশি কী নিরন্তর পরিশ্রম! আমরা এই বিশ ভাগ মাসআলায় কোন মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করছি? আমাদের কাফের, নিকৃষ্ট মুশরিক প্রমাণ করাটাই যেন তাদের দিবানিশির একমাত্র চিন্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ মিশন! এখানেও তাদের সেই মজ্জাগত চরিত্র উন্মিষিত হয়েছে। জালিয়াতির বৃত্তায়নেই তারা আচ্ছন্নের মতো ঘোরাঘুরি করছে। জনসাধারণকে এই বলে ধোঁকায় ফেলছে যে, মুকাল্লিদরা পুরো দ্বীনকেই তাকলীদের অন্ধকার কুঠরির প্রকোষ্ঠে(?) থেকে বের করেছে! অনেক সাধারণ লোক তাদের প্রতারণার ফাঁদে আটকা পড়ছে। কারণ, জনসাধারণের তো মাসআলা-মাসায়েলের দলিল-প্রমাণাদি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আর প্রত্যেক মাসআলাকে দলিলের সাথে জানাটা জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনও নেই। কত বড় সূক্ষ্ম জালিয়াতি!

অথচ, এই মাত্রই আমি উল্লেখ করলাম, আমাদের ইসলাম ধর্মের কত মাসায়েল অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত আর কত মাসায়েলে ইমামদের ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়েছে?

আক্বীদার ক্ষেত্রে তাকলীদ :

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মৌলিক আক্বীদার প্রায় সবকটি বিষয় কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট আয়াত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিছু কিছু আক্বীদার উৎস ইজমায়ে উম্মত (উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) রয়েছে। যেমন, হযরত ঈসা (আ.) কে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেওয়া, পুনরায় এ ধরায় আগমন করা, হযরত ইমাম মাহদীর দুনিয়াতে আগমন, দাজ্জালের সাথে সংঘর্ষসহ আমাদের আক্বীদার বড় একটি অংশ ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন অধিকাংশ আকায়েদের উৎস কুরআন এবং হাদীস। আমরা আকায়েদের ক্ষেত্রে মুকাল্লিদ নই। তবে কখনো যদি আকায়েদের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ইমাম আবুল হাসান মাতুরীদির মতকেই গ্রহণ করে থাকি। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অনুসারীরা আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে কোন তাকলীদের নিন্দা করা হয়েছে?

সারকথা হচ্ছে, আমরা যে তাকলীদের প্রবক্তা, যে তাকলীদকে আমরা জায়েয, ওয়াজিব লি-গাইরিহি বলে থাকি, সে তাকলীদ আর পবিত্র কুরআনের ভর্ৎসিত আর নিন্দিত তাকলীদ এক নয়। উভয়টার মাঝে আসমান-যমীনের তফাত রয়েছে। আমরা যে তাকলীদের প্রবক্তা, সে তাকলীদের প্রতি পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। এবং উলিল আমরের আনুগত্য করো। (সূরা নিসা-৫৯)

লা-মাযহাবীদের ভাষ্য হচ্ছে, এখানে 'উলিল আমর' থেকে খোলাফা উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের গোয়ার্তুমিমূলক এই বক্তব্য খুব একটা হালে পানি পাওয়ার কথা নয়। কারণ, খলীফারাও যদি কোনো সময় শরীয়তবিরুদ্ধ কোনো আইন প্রণয়ন করে, তাও প্রত্যাখ্যাত হবে। যেমন আমি পূর্বে আলোচনার সময় বনী উমাইয়ার কয়েকজন শাসকের কথা উল্লেখ করেছি, যাদের শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেমরা। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)ও ছিলেন সেই মুবারক জমাতের একজন দীপিত তারকা। খলীফারা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতিকে অনুসরণ করবে, এ বিষয়ে তিনিই সর্বপ্রথম রচনা করেন কিতাবুল কাযা। তাহলে বোঝা গেল, খলীফারা সাধারণত নিজ যুগের আলেম-ওলামাদের অনুরক্ত এবং অনুসারী হয়ে থাকেন। আর ইতিহাসের দিকে একটু গভীরভাবে তাকালেই দেখা যায়, যেকোনো যুগেই কোনো শাসক যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রণয়ন করেন, সে যুগের সত্যের ঝাণ্ডাবাহী আলেম-ওলামারা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মহাপ্রাচীর গড়ে তোলেন। এই কথাটি খোলাফায়ে বনু উমাইয়া, খোলাফায়ে বনু আব্বাসিয়া, খোলাফায়ে উসমানিয়ার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তদ্রূপ হাল যমানার শাসকদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রকৃত 'উলুল আমর' বা মূল নিয়ন্তা হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের পবিত্র এই জামাত, তখন থেকে অদ্যবধি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যোগ্য উত্তরসূরি এবং শক্তিমন্ত স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দ্বীনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় জলসিঞ্চন করে যারা একে সজীব এবং সতেজ রেখেছেন। তাই যারা এখানে উলুল আমর থেকে খলীফাই উদ্দেশ্য বলে ডামাডোল পিটিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চান, তারা মূলত পৃথিবীর সুদীর্ঘকালের বর্ণিল ইতিহাসকে অস্বীকারের অপপ্রয়াস চালান। কারণ, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কোনো শাসক যখনই ইসলামের বিধানকে উপহাস কিংবা এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে অপপ্রয়াস চালিয়েছে, সেখানে ইতিহাসের ওই সব নর্দমার কীটের অপপ্রয়াসকে রুখতে কাদের বজ্রনিনাদ উচ্চকিত হয়েছে? কাদের ও জস্বী হুংকারে বাতিলের মসনদ থরথর করে বারবার কেঁপে উঠেছে? বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসের সেই অধ্যায়টি আবার সযত্নে উল্টিয়ে দেখুন! সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে পৃথিবীকে তুচ্ছজ্ঞানকারী এসব ওলামায়ে কেরামের নাম। তাহলে উম্মতের মূল চালিকাশক্তি কারা? খোলাফা না ওলামা? উম্মাহর মূল চালিকাশক্তি যেহেতু এসব ওলামায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে ইজাম, তাই এদেরকে অনুসরণ করতে পবিত্র কুরআনে বারবার নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ :

আমি যে বললাম, এই আয়াতে 'উলুল আমর' থেকে ওলামা এবং ফুকাহায়ে কেরামই উদ্দেশ্য, এটা কোনো গালগল্প কিংবা আষাঢ়ে কাহিনী নয়। বরং সর্বজনবিদিত মুফাসসিরীনে কেরাম এবং প্রখ্যাত তাফসীরবেত্তাদের অভিমত হচ্ছে, এই আয়াতে উলুল আমর থেকে ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে কেরামের পবিত্র জামাতই উদ্দেশ্য। এ মতের স্বপক্ষে রয়েছেন হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত মুজাহিদ (রহ.), আতা ইবনে আবী রাবাহ, আতা ইবনে ছাইব, হাসান বসরী (রহ.) ও হযরত আবুল আলিয়া (রহ.) সহ বিশ্ববরেণ্য অসংখ্য তাফসীরকার। প্রখ্যাত তাফসীরকার হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.)সহ প্রসিদ্ধ সকল তাফসীরকার এ মতকেই প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'উলুল আমর' মানে ওলামা হওয়াই শ্রেয়। (ইবনে কাসীর ১/৫৩০, আবু সাউদ ২/১৫৫, মারাগী ২/১৬৬)

আরেকটি আয়াত দেখুন :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ন্যস্ত করো। এটাই শ্রেয়তর পন্থা এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা শুভ। (সূরা নিসা-৫৯)

উপরোক্ত অংশটি প্রথম আয়াতেরই অংশবিশেষ। আয়াতটির অর্থ আবার গুরুত্ব সহকারে পড়ুন। সেখানে বলা হচ্ছে, যখন কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেবে। তখন তোমরা এ বিষয়কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর ন্যস্ত করো। স্পষ্ট কথা হচ্ছে, যেসব বিষয়াদি অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত, সেখানে মুসলমানদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, আকায়েদের ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই। ঈমানে মুফাসসলে যে সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। (সেই সাতটি বিষয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী

কিতাব, রাসূলবৃন্দ, শেষ দিবস, তাকদীরের ভালো-মন্দ এবং পুনরুত্থান দিবসের ওপর বিশ্বাস) সেসব বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কোনো মতবিরোধ নেই। আমি এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, স্পষ্ট প্রমাণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয় না। মতভেদ হচ্ছে কেবল ওই সব বিষয়ে, যেসব বিষয়ে পবিত্র কুরআন-হাদীসে একাধিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অথবা যেসব বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বাহ্যত সংঘর্ষ মনে হয়। এমন পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআন বলছে, সেসব বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সমাধান জেনে তদনুযায়ী আমল করো। এখন জানার বিষয় হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমাধান কোনটি? তা জানব কিভাবে? সহজ উত্তর হচ্ছে, তা জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং মুজতাহিদ ইমামগণ। কারণ, শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধানাবলির নাঁড়িনক্ষত্রও তাদের নখদর্পণে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের বোধ এবং বিবেচনাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য এবং অনুসরণীয়। সুতরাং তাদের কাছে থেকেই জেনে নিতে হবে এসব মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের সঠিক সমাধান।

আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

অর্থ : তাদের কাছে যখন কোনো শান্তি বা ভীতির সংবাদ আসে, তারা তা যাচাই-বাছাই না করে প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা যারা কর্তৃত্বের অধিকারী, তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত। (সূরা নিসা-৮৩)

এই আয়াতে আপামর জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কোনো সংবাদ শুনে তোমরা নিগূঢ় অর্থ উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। বরং তোমরা সংবাদটা ওদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও, যাদের রয়েছে প্রচণ্ড উদ্ভাবনী শক্তি এবং ঘটনার গভীরে গিয়ে যাচাই করার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। এই আয়াতের সারনির্যাস হচ্ছে, যাদের কাছে খোদা প্রদত্ত এ অপরিমেয় যোগ্যতা এবং মনীষা নেই, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, নিজেদের যাবতীয় সমস্যা তাদের বড়দের সামনে উপস্থাপন করা।

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলো, যারা জানে না এবং যাদের জ্ঞানের চৌহদ্দি অত্যন্ত সীমিত, তারা বিদ্বান এবং জ্ঞানী লোকদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের দিকনির্দেশনা মতে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে। এটাকেই পরিভাষায় তাকলীদ বলা হচ্ছে। পবিত্র কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত কর্মপন্থাকে শিরক আখ্যা দেয়া কতটুকু ঈমানদার সুলভ কাজ? লা-মাযহাবী সুহৃদদের কাছে বিষয়টির পুনর্বিবেচনার আবেদন রইল।

সূরা তাওবার একটি আয়াত দেখুন-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থ : মুসলমানদের পক্ষে এটা সমীচীন নয়, তারা সকলে একসঙ্গে জিহাদে বের হয়ে যাবে। সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ জিহাদে বের হবে, যাতে যারা জিহাদে যায়নি, তারা দ্বীনের উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করে এবং যখন তাদের কওমের সেই সব লোক (যারা জিহাদে গিয়েছে তারা) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তাদেরকে সতর্ক করে, ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে। (সূরা তাওবা-১২২)

এই আয়াতে বলা হচ্ছে, ওলামায়ে কেরাম যখন জনসাধারণকে বশীর এবং নযীর (সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী, সমস্ত নবী-রাসূল এই বিশেষ দুটি গুণে গুণান্বিত ছিলেন) হিসেবে উম্মতকে ভীতি প্রদর্শন করবেন, তাদেরকে শরীয়তের বিধানাবলি বর্ণনা করবেন, তখন উম্মতের জন্য তদানুযায়ী আমল করা অবশ্য কর্তব্য। এটা তাকলীদ বৈ আর কী?

তাকলীদ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আয়াত হচ্ছে-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ : তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে ইলম থেকে জিজ্ঞেস করো। (সূরা আল আম্বিয়া-৭, সূরা আন নাহল-৪৩)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইলম ও গবেষণায় অনভিজ্ঞদেরকে আহলে যিকর বা ইলম ও গবেষণায় বিজ্ঞদের থেকে জেনে নিতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে অনভিজ্ঞদের ওপর বিজ্ঞদের থেকে জেনে নেয়া ও তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব (একান্ত অপরিহার্য) বোঝা গেল। এটার নামই তাকলীদ নয় কি?

সূরা তাওবার একটি আয়াতে বলা হচ্ছে,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

অর্থ: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং নিষ্ঠার সাথে যারা তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন

উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তাঁরা সর্বদা থাকবে। (সূরা তাওবা-১০০)

এই আয়াতে পরবর্তী ওই সব প্রজন্মের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা পূর্ববতী সলফে সালেহীনের অনুসরণ করবে। কোথায় অনুসরণ করবে? কুরআন বলছে, بـــاحســـان অর্থাৎ, সৎ কাজে অনুসরণ করবে। আমরাও পূর্ববতীদের অনুসসরণ করে থাকি। কারণ পূর্ববর্তীদের ওপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস এবং অবিচল আস্থা রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সত্যের ঝাণ্ডাবাহী, ন্যায় এবং ইনসাফের বিমূর্ত প্রতীক, হক্বের প্রশ্নে আপসহীন। এটাই আমাদের চূড়ান্ত বিশ্বাস। সুতরাং তাদের পক্ষে অসৎ কাজের নির্দেশ প্রদান কিংবা তাদের অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বিশ্বাস থেকেই আমরা তাদের তাকলীদ করে থাকি, যা মূলত পবিত্র কুরআনেরই নির্দেশ।

সূরা ফাতিহায় আমরা দৈনন্দিন পাঠ করে থাকি-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ـ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন। অর্থাৎ তাদের পথে, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন। (সূরা ফাতিহা- ৬-৭)

এখন প্রশ্ন হলো, যাদেরকে মহান আল্লাহ নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন, তাদের পরিচয় কী? এর জবাব হলো, তাদের পরিচয় হিসেবে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

অর্থাৎ, যাদেরকে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, তারা হলেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। বন্ধু হিসেবে তারা কতই না উত্তম! (সূরা নিসা-৬৯)

মোটকথা, এ আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হলো যে, চার দল ব্যক্তিবর্গের পথ সরল পথ। নবীদের পথ যেমন সরল পথ, তেমনিভাবে সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের পথও সরল পথ হিসেবে গণ্য এবং তাদের পথই অনুসরণীয়। বরং মহান আল্লাহ তাদের পথে যেন পরিচালিত করেন, সে জন্য আমাদেরকে তার নিকট প্রতিদিন প্রার্থনা করারও শিক্ষা দিয়েছেন। তাই যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে, তারাই সরল পথের পথিক। আর এ অনুসরণকে আমরা ভিন্ন শব্দে তাকলীদ করা বলছি। উপরোক্ত আয়াত থেকে এ শিক্ষাও আমরা পাই যে, যারা উপরোক্ত চার দলের অনুসৃত পথ অনুসরণ না করে ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে, তারা আল কুরআনের ভাষায় সরল পথবিচ্যুত ভ্রান্তপথের পথিক হিসেবে পরিগণিত হবে। আর একেই বলা হয় গাইরে মুকাল্লিদ-লা-মাযহাবী বা অমান্যকারী দল, এটা কিন্তু আমার মনগড়া কথা নয়, পবিত্র কুরআন বলছে এ কথা।

(اعاذنا الله منهم)

সর্বশেষ আরেকটি আয়াত দেখুন–

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থ : সরল পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথের অনুসরণ করে, তবে সে যে দিকে যেতে চায়, সে দিকে তাকে প্রত্যাবর্তিত করব এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব, যা তার জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা নিসা-১১৫)

এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত এই আয়াতে মুমিনদের রাস্তাকে সঠিক পথ আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তাদের বিরোধকদের পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মুমিনদের বিপরীত পথের অনুসরণকারী, তথা যারা মুমিনদের ইজমার (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) বিপরীত পথের অনুসরণ করবে, কুরআনের শাশ্বত ঘোষণায় তারা জাহান্নামের উপযুক্ত।

বিখ্যাত সাধক মোল্লা জীওন (রহ.) লেখেন, উক্ত আয়াত থেকে 'ইজমা' কুরআন-হাদীস সমতুল্য শরীয়তের দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হলো। (তাফসীরে আহমদী-৩১৬)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি তিনশ'বার কুরআন গবেষণা করে বুঝলাম যে, উক্ত আয়াত ইজমা শরীয়তের দলিল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। (তাফসীরে কাবীর ৩/৩২২)

লক্ষ করুন!

ওপরে মাত্র কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পথে চলতে হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তাদের পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ, বিশেষত জগৎখ্যাত চার ইমামের (ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) অনুসরণ করা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইলমের যে মহামূল্যবান সম্পদ উম্মাহর জন্য রেখে গেছেন, তার যথাযথ সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব তারাই অতীতে আঞ্জাম দিয়েছেন। বর্তমানেও দিচ্ছেন। ভবিষ্যতেও তারাই এই ময়দানে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী।

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-৭

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

ঐক্যের নামে অনৈক্যের ডাক

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন,

When I ask a muslim: what is he? What school of thought do you belong to? What is his mazhab? Most of the Indians tell me : they are Hanafi. Some may say : they are Safii. If I go to out side of the India and I ask this question, beside hanafi, or Safii I get the reply I am Hanboly. Or some may say they are Maleki...

"যখন আমি কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি, সে কোন মাযহাবের? "অধিকাংশ ইন্ডিয়ান বলে যে, তারা হানাফী। কেউ বলে তারা শাফেয়ী। আমি যদি ইন্ডিয়ার বাইরে গিয়ে এ প্রশ্ন করি, তখন হানাফী ও শাফেয়ী ছাড়াও অনেকে উত্তর দেবে যে, তারা হাম্বলী..."

ডা. জাকির নায়েক আরও বলেছেন–

Which is better? Hanafi is better or Shafi is better? Most of these groups of Muslims will give the reply "Charu Moslok Bor Haq Hai"- All the four scools of thaougt are on the truth. That is the common reply that all the four scools of thought Hanafi, maleki, Shafi, hanboli, all of these four scools of thought they are BorHaq, they are correct. Some will say Hanafi is right, some say Shafi is right. But the majority says "Charu Moslok Bor Haq Hai" - All the four schools of thought are correct.

কোনটি উত্তম? হানাফী, নাকি শাফেয়ী? মুসলমানদের অধিকাংশ উত্তর দেবে, চার মাযহাবই সঠিক। সাধারণ উত্তর হলো, চার মাযহাব তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী সঠিক। কেউ হয়তো বলতে পারে, হানাফী উত্তম। কেউ হয়তো বলতে পারে শাফেয়ী উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ বলবে যে, চারও বরহক হ্যাঁয় (চারও মাযহাব সঠিক)। চার ইমাম সকলেই সঠিক।"

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/Strickly Following a Madhab _ Dr Zakir Naik _ part - 1 - of - 2 - YouTube_1 http://www.youtube.com/watch?v=6wbBlvZszMA)

ডা. জাকির বলেছেন, অধিকাংশ মুসলমান চার মাযহাবকে সঠিক বলে থাকে, কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, অধিকাংশ মুসলমান যখন চার মাযহাবকে সঠিক বলছে, আপনি তাকে ভুল বলছেন কেন?

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, "চারও মাযহাব সঠিক" এটি হলো, "কমন উত্তর"। আমাদের প্রশ্ন হলো, এটি যদি "কমন রিপ্লাই" হয়ে থাকে, তবে সেটি তাঁর নিকট কেন "আন কমন" মনে হচ্ছে?

ডা. জাকির নায়েক বলছেন, মেজোরিটি অব দ্য মুসিলম উম্মাহ...অর্থাৎ অধিকাংশ মুসলিম চার মাযহাবের অনুসরণ করছে, তখন আমরা বলব, আপনি কেন এই মেজোরিটি থেকে বেরিয়ে আসছেন? অধিকাংশ মুসলমান যখন মাযহাব মানছে, তখন আপনি কেন তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করছেন? যেখানে সুন্নী মুসলমানদের সকলেই (সমগ্র মুসিলম উম্মাহ ৯২.৫ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৭.৫ ভাগ শিয়া) চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করছে, তবে মুসলিম উম্মাহের এই বৃহৎ জামাত থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করাটা কি ইসলামে বিভক্তি নয়?

ইসলামের শিক্ষা হলো, মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে থাকা আবশ্যক। এর মাঝেই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে। মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিভিন্ন হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক যে 'মেজোরিটি'-এর কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে কেউ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যেদিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান।"

[সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেছেন,

فإنه قد ضُمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة

"উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ মর্যাদা এবং তাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানের কারণে তাদের ঐকমত্যের বিষয়টি ত্রুটিমুক্ত হওয়ার যিম্মাদারি নেয়া হয়েছে। আর এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।"

[তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-২,

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে, অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারো।"

[সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ১০৩]

মুফাসসিরগণ আয়াতে উল্লিখিত "হাবলুল্লাহ" বা আল্লাহর রজ্জুর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন হাবলুন অর্থ হলো, কুরআন, প্রতিশ্রুতি, মুমিনদের জামাত এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ইত্যাদি।

তাফসীরে কাবীরে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) এ সকল অর্থের মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলেছেন,

وهذه الأقوال كلها متقاربة ، والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحرزا من السقوط فيها وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله ، وأمروا بالاعتصام به.

"উল্লিখিত অর্থগুলো পরস্পর নিকটবর্তী। এ ক্ষেত্রে সার কথা হলো, কূপে নামার সময় কোনো ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য যেমন রশি ইত্যাদি বেঁধে নেয় তেমনি কুরআন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, তার দ্বীন, তার আনুগত্য এবং মুমিনদের জামাতের সাথে ঐকমত্য পোষণ কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নামের গভীরে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।"

(তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৮)

মুসলমানদের জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

প্রথম হাদীস–

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة

"তোমাদের ওপর জামাতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। কেননা শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দুজন থেকে দূরে থাকে। যে জান্নাতের মাঝখানে অবস্থান করতে চায় সে যেন জামাতকে আঁকড়ে ধরে।"

(তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২১৬৫)

দ্বিতীয় হাদীস :

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

يد الله مع الجماعة

"জামাতের সাথে আল্লাহর হাত রয়েছে।"

(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২১৬৬)

তৃতীয় হাদীস :

إن الله لا يجمع أمتى أو قال أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে অথবা (রাসূল সা. বলেছেন) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতে গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না। মুসলমানদের জামাতের সাথে আল্লাহর হাত রয়েছে। যে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে জাহান্নামে নিপতিত হলো।"

(তিরমিযী শরীফ কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২১৬৭)

أخرج أبو داود فى سننه من حديث معاوية بن أبى سفيان عن النبى صلى الله عليه وسلم :(قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة وإنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে আর একটি দল জান্নাতে যাবে। তারা হলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত "মুসলমানদের জামাত"। আর আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে তাদের প্রবৃত্তিপূজা এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমন জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে।

(কিতাবুস সুন্নাহ, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৪৫৯৭, হাদীসটি হাসান)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

"يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذى أمرَ به، وإنّ ما تكرهون فى الجماعة والطاعة،

هو خيرٌ مما تستحبون فى الفرقة"

"হে মানব সকল! তোমাদের জন্য জরুরি হলো, আনুগত্য ও মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা এটি আল্লাহর রজ্জু, যাকে আঁকড়ে ধরার আদেশ তিনি দিয়েছেন। আর তোমরা আনুগত্য ও জামাতবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি কোনো কিছু অপছন্দ করো সেটি তোমাদের জন্য বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে কোনো কিছুকে পছন্দ করার চেয়ে উত্তম।

(তাফসীরে তবারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০)

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) বলেন,

إن الجماعة حبلُ الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى

"নিশ্চয় মুসলমানদের জামাত হলো, আল্লাহর রজ্জু, সুতরাং তোমরা সুদৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরো।

[তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) বলেছেন,

ونتيجة الجماعة :رحمة الله ورضوانه، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه.

"জামাতকে আঁকড়ে ধরার ফল হলো, আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। এটি পরকালে মুখ ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যম।"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১৭]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরও বলেন,

"فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب"

"নিশ্চয় জামাতবদ্ধ থাকা হলো আল্লাহর রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব।"

(মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২১)

লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস বা সালাফীরা সর্বপ্রথম এই আওয়ায তুলেছে যে, 'আমরা কোনো মাযহাব মানি না বরং আমরা শুধু কুরআন ও হাদীস মানি।' এই স্লোগান দিয়ে তারা মুসলমানদের মাঝে নতুন একটা দল সৃষ্টি করেছে।

লা-মাযহাবীরা মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে তারা কি মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখেছে নাকি মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করেছে? তাদের বই পড়ে দেখুন! অনেকেই মাযহাবীদেরকে কাফের, মুশরিক ইত্যাদি বলে থাকে। আর এটি তাদের নিকট একটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা নিজেরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে একদল অপর দলকে কাফের বলছে

ডা. জাকির নায়েক "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন-

Ahle Hadith, which Ahle Hadith? In Bombay there are two Ahle Hadith, Jamiete Ahle Hadith, and Gurba Ahle Hadith. Which Ahle Hadith do you belong to? One Ahle Hadith is blaming the other Ahle Hadith.

"আহলে হাদীস! কোন আহলে হাদীস? বোম্বেতে আহলে হাদীসদের দুটি দল রয়েছে, ১. জমিয়তে আহলে হাদীস ২. গুরবা আহলে হাদীস। তুমি আহলে হাদীসের কোন গ্রুপের? এক আহলে হাদীস আরেক আহলে হাদীসকে দোষী সাব্যস্ত করছে।"

(আহলে হাদীস ও সালাফীদের সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের এ আলোচনাটি ইউটিউবে নিম্নের শিরোনামের পাওয়া যাবে- Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0)

তিনি আরও বলেছেন,

In the Ahle Hadith, I went to Kashmir, there are many groups of Ahle Hadith, I went to Kerala, Mujahidin - KNM, Kerala Nadvathul Mujahideen. There, people don't call themselves Ahle Hadith - Mujahideen. If you go to Saudi Arabia and say: I am Ahle hadith, what is this new Ahle hadith? Very few people of Saudis know who that Ahle Hadith. For them they know the Salafi. But Salafi and Ahle hadith belong to the same, groups or names are different. In some country Ansari, why?

"আহলে হাদীসদের মাঝেও অনেক গ্রুপ রয়েছে। আমি কাশ্মীরে গিয়েছি, সেখানে আহলে হাদীসদের অনেক গ্রুপ। আমি কেরালায় গিয়েছি, সেখানে তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে না। তারা কেরালা নাদভাটুল মুজাহিদীন (কেএনএম) নামে পরিচিত। আপনি যদি সৌদি যান সেখানে গিয়ে যদি বলেন, "আমি আহলে হাদীস, তারা বলবে, এ নতুন আহলে হাদীস আবার কারা? অধিকাংশ আরব জানে না যে, আহলে হাদীস কী? তারা সালাফী গ্রুপকে চেনে। যদিও সালাফী ও আহলে হাদীস একই দল, এদের নাম ভিন্ন। আবার দেখা যায়, একই দেশে এদের কোন গ্রুপের নাম আনসারী, এটি কেন?

(আহলে হাদীস ও সালাফীদের সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের এ আলোচনাটি ইউটিউবে নিম্নের শিরোনামের পাওয়া যাবে- Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0)

সালাফীদের সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক বলেছেন,

Sheikh Nasiruddin Albani says we should call ourselve salafi. My question is which Salafi, my counter question Do you know how many Salsfi are there? Are you Kutubi, Sururi, or Madkhali. I can name another Salafi.

"শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী বলেন, আমাদের নিজেদেরকে সালাফী বলা উচিত। আমার প্রশ্ন হলো, কোন সালাফী? আমার উল্টো প্রশ্ন, তুমি কি জানো, সালাফীদের কতগুলো গ্রুপ

আছে? তুমি কি "কুতুবী, সুরুরী নাকি মাদখালী? আমি সালাফীদের আরও অনেক গ্রুপের নাম বলতে পারব।"
(http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0)

"But even in Salafi there are various groups and if you go to U.K. Mashallah! Subhanallah! Allahu Akbar! There are so many groups. In U.K each group fighting against the other, calling the other Salafia kafir, Nauzubillah! . . . Which salafia do you belong to?

"সালাফীদের নিজেদের মধ্যেই অনেক গ্রুপ রয়েছে। তুমি যদি যুক্তরাজ্যে যাও, মাশাআল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! সেখানে সালাফীদের অনেক গ্রুপ। একদল আরেক দলকে কাফের বলে তাদের সাথে ফাইট করছে, নাউযুবিল্লাহ! সুতরাং তুমি কোন সালাফী?
(http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0)

সালাফীদের যদি এ অবস্থা হয়, তবে তারা চার মাযহাব ছেড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে মুসলিম উম্মাহের ক্ষতি হয়েছে, নাকি লাভ হয়েছে? মুসলিম উম্মাহ কি এক প্লাটফরমে এসেছে, নাকি তাদের অনৈক্য আরও বেড়েছে? তাদের দাবি হলো, আমরা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস মানব, তবে তাদের মাঝে এত গ্রুপিং কেন? আর ডা. জাকির নায়েক তাদের প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম উম্মাহের ঐক্যের ডাক দিলেন নাকি অনৈক্যের?

ডা. জাকির নায়েক তার শ্রোতাদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলেছেন। তাঁর শ্রোতা যদি দশ হাজার থাকে, তবে দেখা যাবে, কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে দশ হাজার মাযহাব গড়ে তুলবে। পরিণতি এক। পৃথিবীতে তখন চার মাযহাব থাকবে না, এ রকম হাজার হাজার গ্রুপের সৃষ্টি হবে। এই বাস্তবতাকে কোনো বিবেকবান মানুষই অস্বীকার করতে পারবে না।

ডা. জাকির নায়েক ইসলামে অন্যের অনুসরণ বা তাকলীদকে বৈধ মনে করেন না। তিনি মনে করেন, প্রত্যেককে সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে হবে। অথচ আমরা দেখি, তিনি তার লেকচারে কিংবা প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইলের সমাধান দিয়ে থাকেন। তিনি কেন এ সমস্ত মাসআলার সমাধান দেন? কারও জন্য যদি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রদত্ত মাসআলা গ্রহণে সমস্যা থাকে, তবে ডা. জাকির নায়েকের মাসআলা গ্রহণে আপত্তি থাকবে না কেন? কাউকে যদি অনুসরণ করা অবৈধ হয়ে থাকে, তবে তিনি কেন প্রশ্নকারীকে বলে দেন না, আপনি কুরআন ও হাদীস দেখে নিন! যদি সত্যিকার অর্থে একমাত্র কুরআন-হাদীস অনুসরণেরই দাওয়াত হয়ে থাকে তবে তাঁকে নিশ্চয় বলতে হতো আপনি কুরআন-হাদীস দেখে নিন। তিনি ব্যাখ্যা করতে যান কেন? ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা মানা যদি শিরক হয়ে থাকে তবে ডা. জাকির নায়েকের ব্যাখ্যা মানা কুফরী হবে না কেন? কুরআন-হাদীসে তো এমন কোনো কথা নেই যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাসআলায় ভুল হলেও ডা. জাকির নায়েকের মাসআলায় কোনো ভুল হবে না? এরূপ দাবি তো যারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার তারা করে থাকে। তাহলে ডা. জাকির নায়েক...?

ডা. জাকির নায়েকের কোনো কোনো অনুষ্ঠানে অনেক শ্রোতা থাকে। তিনি তাদের সবাইকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলছেন। শ্রোতাদের অধিকাংশ এমন যে, কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করা তো দূরে থাক, সঠিকভাবে কুরআন ও হাদীস পড়ারই যোগ্যতা রাখে না। এদেরকে তিনি যখন কুরআন ও হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দিলেন, তখন প্রত্যেকেই সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে প্রতিটি মাসআলা বের করে করে আমল করবে। শরীয়তের বিষয়ে এ ধরনের অজ্ঞ লোকেরা যখন কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে নিজেদের মতামত পেশ করতে থাকবে, তখন তাদের মাঝে কি একটি মতবাদ থাকবে নাকি হাজার মতবাদের সৃষ্টি হবে? এতে কি এক মাযহাব থাকবে নাকি কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ মাযহাবের সৃষ্টি হবে? সুতরাং এ ঐক্যের ডাকের মূলেই রয়েছে মহা অনৈক্য।

আর যদি ডা. জাকির নায়েক মনে করেন, তার শ্রোতারা চার মাযহাবের অনুসরণ না করে তাঁর দেয়া মাসআলার ওপর আমল করবে, তবে আমরা বলব, তিনি নিজেই শরীয়তের বিষয়ে অন্যকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং ডা. জাকির নায়েকের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তার পক্ষে যেমন শরীয়তের বিষয়ে কোনো মাসআলা দেয়া জায়েয নয়, তেমনি তার শ্রোতাদের কারও জন্যও কোনো মাসআলার ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা বৈধ নয়। তিনি যদি মাসআলা দেন আর তার শ্রোতারা তার কথার ওপর আমল করে, তবে এ ক্ষেত্রেও তো অন্যের অনুসরণ বা তাকলীদ করা হলো, যা তার দৃষ্টিতে অবৈধ। অথচ আমরা দেখি, তিনি তার লেকচারে বিভিন্ন মাসআলা প্রদান করে থাকেন। তিনি কেন এ ধরনের স্ববিরোধীতার আশ্রয় নেন?

ডা. জাকির নায়েক মাযহাবের অনুসরণকে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করেছেন। মূলত তাকলীদ তথা মাযহাবের অনুসরণ মুসলমানদের অনৈক্যের কোনো কারণ নয়। মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ এর

ওপর ঐকমত্যের সাথে আমল করে আসছে। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, চার মাযহাবের অনুসরণ করেই মুসলিম উম্মাহ নিজেদের ঐক্য ও সংহতিকে টিকিয়ে রেখেছে। একই সাথে তারা হজ পালন করে, একই সাথে তারা সালাত আদায় করে, একই ইমামের পিছে কেউ আস্তে আমীন বলছে, কেউ জোরে আমীন বলছে, কিন্তু কেউ কখনও কাউকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলে না যে, তুমি ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব অনুসরণ করে জোরে আমীন বললে কেন, তুমি ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুসরণ করে আস্তে আমীন বললে কেন?

আমরা জানি যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তাবলীগ জামাতের সকলেই কি এক মাযহাবের অনুসারী? কখনও নয়। তাদের মাঝে কেউ হানাফী, কেউ শাফেয়ী, কেউ মালেকী...। কিন্তু চার মাযহাব হওয়ার কারণে তাদের মাঝে কখনও কি কোনো তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে? মাযহাব অনুসরণ করেও আল-হামদুলিল্লাহ সকলেই ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে।

সুতরাং শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে চার মাযহাব পরস্পর অনৈক্যের শিকার, এ দাবি করা নিতান্তই অযৌক্তিক; বরং যারা মুসলিম উম্মাহকে এক করার মানসে নতুন মাসআলা-মাসাইল দিতে শুরু করেছে, তারাই আরেকটা দল সৃষ্টি করে বসেছে। চার মাযহাব অনুসরণ করা যাবে না, বর্তমান সময়ে এ আওয়ায তুলেছে, সালাফী বা আহলে হাদীসগণ। তারা মানুষকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার আহ্বান করলেও নিজেরা অধিকাংশ মাসআলায় তাদের সমমনা কোনো আলেমের বক্তব্য অনুসরণ করে থাকে।

এ সম্পর্কে ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

প্রশ্ন : কিছু কিছু দায়ী রয়েছেন, যারা মুসলিম উম্মাহকে এক হওয়ার মতামত পেশ করে থাকেন এবং 'ইসলামী সমাজে যেকোনো ধরনের অনৈক্য নিষিদ্ধ' এ বক্তব্য জোরালোভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। সুতরাং মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত থাকাটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এবং তারা বলে থাকেন, ইসলাম ঐক্য ও সংহতির ধর্ম। সমস্ত মানুষ একই চিন্তাধারায় পরিচালিত হবে এবং একই দল ও মতের অনুসারী হবে; যারা হবে আল্লাহর দল বা হিযবুল্লাহ্। সুতরাং তারা মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐক্যের জোর দাবি জানিয়ে থাকেন।

উত্তর : উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে ডা. ইউসুফ আলকারজাবী বলেছেন-

أجاب الدكتور القرضاوى :أنا أقول هناك فرقاً كبيراً بين الاختلاف والتفرق، هناك اختلاف مشروع وهناك تفرق ممنوع، الاختلاف المشروع اختلاف الناس فى الآراء وفى السياسات، وفى المناهج وفى هذه الأشياء ..ممكن الناس تختلف فى الأهداف، تتكون جماعات، وتتكون أحزاب لها أهداف مختلفة، أو ترتيب الأهداف؛ جماعة يرون الاقتصاد أولاً، وجماعة تقول لا الأخلاق أولاً، وجماعة تقول لا الوحدة أولاً، وجماعة تقول لا الثقافة أولاً !! ..

"আমি বলব, মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। একদিকে মতপার্থক্য শরীয়তে বৈধ এবং দলাদলি শরীয়তে অবৈধ। শরীয়তসম্মত মতপার্থক্য হলো, মানুষের মতামত, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য। উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিরূপণে মানুষের মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হওয়াটাও স্বাভাবিক। একদলের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অন্য দল থেকে ভিন্ন হতে পারে। কোনো দল অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেবে, কোনো দল চারিত্রিক পবিত্রতাকে গুরুত্ব দেবে। কোনো বিশেষ দল হয়তো বলবে, সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হলো, ঐক্য। হয়তো কোনো দল বলবে, না, বরং সাংস্কৃতিক বিকাশই মুখ্য!

ডা. কারযাবী আরও বলেছেন-

المهم سيظل الناس يختلفون، هذا الاختلاف ليس تفرقاً، اختلاف رأى، لا بد للناس أن تختلف، بعدين نعرض هذا على الناس ليرى الناس أينا أولى بالتقديم وأينا أولى بالتأخير !.. ما تقوله قاله بعض الناس فى الاختلاف الفقهى؛ يعنى هناك دعوة من بعض الناس لإزالة المذاهب الفقهية، ناس يسمونهم اللامذهبيين، يقول لك: المذاهب فرقت المسلمين، إيه معنى مالكى، وشافعى، وحنبلى، وإباضى، وزيدى وكذا ..كل يجب أن يزول، والناس على مذهب واحد ! ..

"বিবেচনার বিষয় হলো, এ-জাতীয় ক্ষেত্রে মানুষ মতপার্থক্য করতে থাকবে। এ ধরনের মতপার্থক্য তাফার্‌রুক বা দলাদলি সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি হলো, মতের ভিন্নতা, যা স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ।

তবে ফিকহী মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য রয়েছে, সে ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য কী? একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা ফিকহী মাযহাবসমূহকে মূলোৎপাটিত করতে চায় এবং নিজেদেরকে লা-মাযহাবী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা আপনাকে বলবে, মাযহাবসমূহ! সে তো মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করেছে এবং তারা উদ্দেশ্য নেয় মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, ইববাজী, যায়দী ইত্যাদি। সবগুলো দূরীভূত হওয়া আবশ্যক এবং সব মানুষকে এক মাযহাবের অনুসারী হতে হবে!

তিনি পরবর্তীতে বলেছেন-

تكون النتيجة أن هؤلاء الناس الذين يدعون إلى إلغاء المذاهب يزيدون

المذاهب مذهباً واحداً، كما نقول نحن :المذهب الخامس، هم فى الحقيقة ده يقولوا آراء ، وإلهم بعض الشيوخ، وإلهم بعض الاجتهادات يجتمعون على هذه الإجتهادات، فأصبح مذهباً جديداً !..إذا زدنا المذاهب مذهباً لم نزل الخلاف، ومحاولة إزالة الخلاف بين الناس لا يزيد الناس إلا فرقة، طبيعة الناس لازم تختلف !..

"ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যে সমস্ত লোক মাযহাব মূলোৎপাটনের দাওয়াত দিয়ে থাকে, তারা আরেক নতুন মাযহাবের সূচনা করে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে তারা পঞ্চম মাযহাবের অবতারণা করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও নিজেদের মনগড়া বক্তব্য পেশ করে থাকে, কখনও কোনো শায়খের উক্তি বর্ণনা করে, কখনও কোনো ইমামের ইজতেহাদের সাথে একমত হয় এবং এভাবে এক নতুন মাযহাবের সৃষ্টি করে। এভাবে আমরা যদি মাযহাবসমূহের ওপর আবার নতুন মাযহাব সৃষ্টির পিছে পড়ি, তাহলে উম্মাহের মাঝে অনৈক্য বাড়বে, তারা আরও বেশি বিভেদে লিপ্ত হবে। মানুষের প্রকৃতিই সেক্ষেত্রে অনৈক্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে।

الصحابة اختلفوا، الصحابة كانوا مختلفين، سيدنا عمر بن عبد العزيز قال :ما أحببت أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنه لو لم يختلفوا لكان أمراً واحداً، ومنهجاً واحداً، أما وقد اختلفوا فقد فتحوا لنا باب اليسر والسعة، تختار أى واحد من الصحابة، فتحوا لنا باب تنوع المنازع وتعدد المشارب

"সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মতপার্থক্য করেছেন, তারা মতপার্থক্য করতেন। উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) বলেছেন, রাসূলের সাহাবীরা (রা.) মতপার্থক্য না করুক, এটি আমি পছন্দ করি না। কেননা তাদের মধ্যে যদি মতপার্থক্য না থাকত, তাহলে একটিই মাত্র পদ্ধতি থাকত, একটি মাত্র তরিকা থাকত। কিন্তু তারা মতপার্থক্য করেছেন এবং আমাদের জন্য প্রশস্ততার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তুমি যেকোনো একজন সাহাবীকে অনুসরণ করো। তারা আমাদের জন্য বিবিধ উৎস ও বিবিধ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন।"

(কাতার ভিত্তিক আল-জাযিরা টিভি চ্যানেলের, সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম "শরীয়ত ও জীবন" (আশ-শরীয়াতু ওয়াল হায়াতু) এ ড. ইউসুফ কারযাবীর সাক্ষাৎকার। আলোচ্য বিষয়, موقف الإسلام من الأحزاب والتعددية السياسية
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/632.html)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত উপসংহারে আসতে পারি–

১.শাখাগত মাসআলা-মাসাআইলের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহের মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা কোনো অনৈক্য ও ফেরকাবাজী সৃষ্টি করে না। এবং একে অনৈক্য ও ফেরকাবাজীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা নিতান্ত বোকামি। মূল কারণ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করা অদূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক অপরিপক্কতাকে আরও প্রকট করে তোলে।

২. চার মাযহাবকে উৎপাটিত করার দাওয়াত মূলত মানুষকে নতুন এক মাযহাব সৃষ্টির দাওয়াত দেয়ারই নামান্তর। কেউ যদি এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে, সেও নতুন কোনো মাযহাব বা ফেরকা প্রবর্তনে আগ্রহী।

৩. মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের ডাক দিয়ে তাদের মধ্যে একটা গৌণ বিষয় নিয়ে তুলকালাম সৃষ্টি করে ফেতনার কুরুক্ষেত্র তৈরিই বা কতটা যুক্তিসঙ্গত। ঐক্যের এটি কোন পদ্ধতি? যে ঐক্যের ডাকের পরিণতি হলো মহা অনৈক্য, সেই ঐক্যই বা কোন ধরনের ঐক্য?

৪. ডা. জাকির নায়েকের বাতলানো ঐক্যের স্বরূপ তো আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তিনি যে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন, সেই একই ডাক দিয়ে সালাফী, লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীসগণ খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তারা নিজেরাই বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে কাফের বলে থাকেন (নাউযুবিল্লাহ)। সুতরাং যেই ঐক্যের ফল হলো, মুসলিম উম্মাহের মাঝে নতুন নতুন ফেতনার জন্মদান এবং সাধারণ মুসলমানদের অনিশ্চয়তার হাতে সমর্পণ, সেটা কিভাবে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐক্য হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এবং Unity in the Muslim Ummah-এর যৌক্তিকতা বা কোথায়?

লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীসদের অভিযোগ হলো, মুসলমানরা চার মাযহাব মেনে ইসলামে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। এক নবী, এক কুরআন, তবে চার মাযহাব মানব কেন ইত্যকার হাজারও প্রশ্ন তারা করে থাকে।

আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, তারা যে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, তারা নিজেরা তার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছে? তাদের মাঝে কি এমন কোনো ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারে?

তিক্ত হলেও সত্য যে, সালাফীরা নিজেদের মাঝে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবি করেছে তার কিয়দাংশও কখনও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি, বরং তারা মুসলিম উম্মাহের মাঝে ফেতনার জন্ম দিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহকে আরও বিভক্ত করেছে।

ডা. জাকির নায়েক শাখাগত বিষয়ের মতভেদকে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এবং তাঁর নিকট এ অনৈক্য থেকে মুক্তির পথ হলো, শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ।

ডা. জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর সালাফীরা এ বিষয়টির জোর প্রচারণা

চালিয়ে থাকেন যে, শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অসুরণ করলেই মুসলিম উম্মাহের মাঝে কোনো অনৈক্য থাকবে না। কিন্তু সালাফীদের এ দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বাস্তবতার পরিপন্থী। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, সালাফী আলেমগণের মাঝে মতভেদ। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

ডা. জাকির নায়েকের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী। আলবানী সম্পর্কে ডা. জাকির বলেছেন, তিনি সাগরতুল্য হলে জাকির নায়েক তার তুলনায় এক ফোঁটা পানির সমতুল্যও নন। বর্তমান সময়ে সালাফীদের ইমামতুল্য আলেম শায়খ নাসীরুদ্দিন এবং অপরাপর উলামাদের মাঝে মতনৈক্যের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো–

১. আল্লামা ইবনে হাযাম (রহ.) গান-বাদ্য ইত্যাদিকে জায়েয মনে করতেন অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহ.) গান-বাদ্য ইত্যাদিকে হারাম মনে করেন।

২. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তিন তালাক একত্রে দিলে এক তালাক হওয়ার পক্ষে। অথচ আল্লামা ইবনে হাযাম যাহেরী একে তিন তালাক মনে করেন এবং মহিলার অন্যত্র বিবাহ না দেয়া পর্যন্ত পূর্বের স্বামীর জন্য তাকে বৈধ মনে করতেন না।

৩. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) সফরের সময় দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার পক্ষে ছিলেন না, অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী সেটাকে বৈধ মনে করেন।

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, আরাফার দিনে গোসল করা রাসূলের সুন্নাত অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী একে বিদ'আত বলেন।

৫. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু করা মুস্তাহাব অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী বলেন, ওযু করা ওয়াজিব

৬. শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করাকে বৈধ মনে করেন অথচ শায়খ সালে আল উছাইমিন একে অবৈধ মনে করেন।

(আল- আলবানী শুযুযুহু ও আখতাউহু, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫)

সালাফীরা যাদেরকে তাদের অনুসরণীয় মনে করে থাকে, তাদের মাঝে যখন বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে, তখন এ দাবি করা নিতান্তই অযৌক্তিক যে, শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করলে মুসলিম উম্মাহের মাঝে কোনো অনৈক্য থাকবে না।

প্রকৃতপক্ষে শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামদের মাঝে যে মতানৈক্য রয়েছে, একে উলামায়ে কেরাম উম্মতের জন্য রহমত মনে করেছেন। সুতরাং যেই বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ এবং মুসলিম উম্মাহের মাঝে স্বীকৃত, সে বিষয়কে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করা নিতান্ত বোকামি। কেননা চার মাযহাব অনুসরণের কারণে মুসলিম উম্মাহের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছে, এটি যেমন প্রমাণিত নয়, তেমন চার মাযহাবকে পরিত্যাগ করলেই যে কোনো অনৈক্য হবে না, এরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ডা. জাকির যখন মাসআলা দেন, তখন তিনি দাবি করেন যে, তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে মাসআলা দিচ্ছেন, কিন্তু ডা. জারিক নায়েক প্রদত্ত অধিকাংশ মাসআলা সমগ্র বিশ্বের উলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি যেমন এ দাবি করতে পারেন না যে, তিনি যা বলবেন সেটিই সঠিক এবং এর ওপর তার অনুসারীরা আমল করলে কোনো অনৈক্য থাকবে না, তেমনি পৃথিবীর কোনো আলেমই এ দাবি করতে পারেন না যে, তার দেয়া মাসআলার ওপর আমল করলে কোনো অনৈক্য থাকবে না।

যারা জগদ্বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং যারা যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন, তাদের মাঝে যখন মতানৈক্য হয়েছে, তখন বর্তমান সময়ে মাযহাবকে মূলোৎপাটিত করে কার মতের ওপর একমত হওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়?

ডা. জাকির নায়েক যদি উদ্দেশ্য এই নিয়ে থাকেন যে, মানুষ মাযহাব ছেড়ে তার দেয়া ফতওয়ার ওপর আমল করবে, তবে মুসলিম উম্মাহ সেটা গ্রহণ করে সকলেই ডা. জাকির নায়েকের ভক্ত হয়ে যাবে, এটা অসম্ভব ও অকল্পনীয়। এখন তিনি যদি সালাফীদের কোনো আলেম যেমন শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী, শায়েখ ইবনে উছাইমিন (রহ.)-এর অনুসরণের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তবে আমরা বলব, দেখুন অসংখ্য মাসআলায় তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। সব মাসআলায় সালাফী আলেমগণ একমত হয়ে যাবেন, এটি একটি অকল্পনীয় ও অসম্ভব বিষয়। আমরা এখানে এ-জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি-

প্রথম উদাহরণ :

"সম্প্রতি ১৪৩০ হি. মোতাবেক ২০০৯ সালে ড. সাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলবারীকের দুই খণ্ডের একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। যার নাম

الإيجاز فى بعض ما اختلف فيه الألبانى و ابن عثيمين و ابن باز رحمهم الله تعالى

কিতাবটির পৃষ্ঠা ৮শ'র অধিক।

কিতাবটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই কিতাবে তিনি এমন কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যেসব মাসআলায় এ যুগের তিনজন সম্মানিত সালাফী আলেম : শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহ.) (১৩৩০-১৪২০ হি.) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে উছাইমীন (রাহ.) (১৪২১ হি.) ও শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রাহ.) (১৩৩২-১৪২০)-এর মাঝে মতভেদ হয়েছে।"

এ তিনজনই তাদের দাবি মতে কুরআন

ও সহীহ হাদীসের অনুসারী ছিলেন। তবে তাদের মাঝে কেন মতানৈক্য হলো? তারা তো আধুনিক প্রযুক্তির যুগের আলেম, যে সম্পর্কে জাকির নায়েক বলেছেন, বর্তমান সময়ে এক মিলিয়ন হাদীস এক ডিস্কে পাওয়া যায়। ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য অনুযায়ী উপর্যুক্ত সালাফী শায়েখদের মাঝে কোনো ধরনের মতভেদ থাকাটা অসম্ভব ছিল, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তাদের মাঝেও বিস্তর মতভেদ হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

শায়েখ সালেহ আল-উছাইমিন যিনি বিখ্যাত সালাফী আলেম, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বেশ কিছু মাসআলা থেকে ফিরে এসেছেন কিংবা কোনো মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন। এ মাসআলাগুলো সম্পর্কে

ما رجع عنه ابن عثيمين أو توقف فيه

নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। শায়খ সালেহ আল-উছাইমিন আধুনিক প্রযুক্তির যুগের আলেম। তিনি হাদীস অনুসরণের ব্যাপারে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। অথচ সকল হাদীসের কিতাব এবং উলামায়ে কেরামের মতামত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের থেকে এমন মতামত প্রকাশিত হয়েছে, যা থেকে পরবর্তীতে তারা নিজেরাই ফিরে এসেছেন কিংবা ওই ব্যাপারে কোনো মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন।

তিনি কোনো মাযহাবী আলেম নন যে, সালাফী বন্ধুগণ তার সম্পর্কে অভিযোগ করার সুযোগ পাবেন। তিনি একজন বিখ্যাত সালাফী আলেম। একইভাবে অনেক মাসআলায় শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীও পূর্বের মত থেকে ফিরে এসেছেন। মূলত মতপার্থক্য হওয়া কিংবা একই মাসআলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত থাকার বিষয়টি এতটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কেউই এর থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

একইভাবে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী অনেক মাসাআলায় পূর্বের মত থেকে ফিরে এসেছেন এবং নতুন কোনো মাসআলা দিয়েছেন অথবা সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি।

তৃতীয় উদাহরণ :

কোনো হাদীসের ওপর আমল করার পূর্বশর্ত হলো, হাদীসের সনদে কোনো দুর্বলতা আছে কি না, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া, অর্থাৎ হাদীসটি কোন স্তরের, সেটি কি সহীহ, যয়ীফ, কিংবা মওযু এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা। সুতরাং হাদীসের ওপর আমল হাদীসের বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী বিখ্যাত সালাফী আলেম। বর্তমানে তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। তিনি পৃথিবী বিখ্যাত অনেক মুহাদ্দিসের হাদীসকে যয়ীফ কিংবা মওযু বলেছেন। এমনকি তিনি নিজেও একজন স্ববিরোধী ছিলেন। কোনো কিতাবে কোনো একটি মাসআলা প্রমাণ করতে গিয়ে একটি সহীহ হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, আবার অন্য কিতাবে সে হাদীসকেই সহীহ বলেছেন। এভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছেন। দু-একটি হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছেন, বিষয়টি এমন নয়, বরং তিনি অসংখ্য হাদীসে এ ধরনের স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ সম্পর্কে যে কিতাবগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে–

আল আলবানী, শুযুযুহু ওয়াখতাউহু।

☆ تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف "

☆ التعقب المتواني على السلسلة الضعيفة للألباني

☆ السبل الوضيحة ببيان أوهام الألباني بين الضعيفة والصحيحة

☆ تراجعات الشيخ الألباني من خلال موقع الدرر السنية

☆ تصحيحُ حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والردّ على الألباني في تضعيفه"

☆ التعريفُ بأوهام من قسم (السنن) إلى صحيح وضعيف "

☆ التعقّبُ الحثيث على من طعن فيما صحَّ من الحديث "

☆ تعقباتٌ على :(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) للألباني "

☆ التعقباتُ المليحة:(على السلسلة الصحيحة)

☆ تناقضاتُ الألباني الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات "

☆ تنبيهُ القارء على تقوية ما ضعفه الألباني "

☆ تنبيهُ القارء لتضعيف ما قواه الألباني "

☆ جزءٌ فيه الردّ على الألباني وبيان بعض تدليسه وخيانته "

☆ تنبيهُ المسلم إلى تعدى الألباني على : (صحيح مسلم)

☆ صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم "

☆ نظراتٌ في :(السلسلة الصحيحة) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني "

☆ تراجِع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحاً وتضعيفا

☆ النصيحة في بيان الأحاديث التي تراجع عنها الألباني في الصحيحة

☆ حديث مما تراجع عنها العلامة المحدث الألباني في كتبه

সুতরাং ডা. জাকির নায়েক যদি চার মাযহাব ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেটা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি অন্য কোনো সালাফী আলেমের অনুসরণের বিষয়টিও মতানৈক্য থেকে মুক্ত নয়।

তবে তিনি চার মাযহাব ছেড়ে মুসলিম উম্মাহকে কিসের দিকে দাওয়াত দিলেন? তিনি নিজেই কি কোনো মাযহাব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, নাকি সালাফী ও আহলে হাদীসদের মাযহাব গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, যারা নিজেরাই একে অপরকে কাফের বলে? যেটাই হোক এসব ঐক্যবদ্ধ মুসলমানদেরকে নতুন করে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করারই অপপ্রয়াস, তাতে সন্দেহ থাকে না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও. মাকসূদুর রহমান

বোড বাজার, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা ১. যে মসজিদের জায়গা সরকারি রেজিস্ট্রি করে ওয়াকফ করা হয়নি, সে মসজিদে জুমু'আর নামায পড়লে আদায় হবে কি না। মসজিদের জায়গা সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করা কি ফরজ, ওয়াজিব নাকি সুন্নাত?

২. মসজিদের নাম "বাইতুল আমীর আলিফ জামে মসজিদ" রাখা যাবে কি না?

সমাধান : ১. শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি জরুরি নয়, বিধায় সেখানে জুমু'আসহ যেকোনো নামায আদায় করা যাবে। মসজিদের জায়গা রেজিস্ট্রি করা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত কিছুই না। শুধু মৌখিক ওয়াকফ করাই যথেষ্ট। তবে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রি করে নেয়াই উচিত। (রাদ্দুল মুহতার ৪/৩৩৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/৩২৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৬/১৫৭)

২. মসজিদের এ ধরনের নাম রাখার মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। (বোখারী ১/৫৯, উমদাতুল কারী ৪/১৫৯, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৬/৯১)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মাও. আইনুল ইসলাম

চটানপাড়া, ভালুকা, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা : ঈদগাহের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে খেলাধুলা করা বা সামাজিক কোনো আচার-অনুষ্ঠান কায়েম করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সংগতিপূর্ণ?

সমাধান : ঈদগাহের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে দুই ঈদের নামায ও দ্বীনি কাজকর্ম ব্যতীত অন্য কোনো কাজ যেমন–খেলাধুলা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান আয়োজন করা জায়েয নেই। সুতরাং ঈদগাহকে খেলাধুলা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক। (রাদ্দুল মুহতার ১/৩৫৭, আল বাহরুর রায়েক ৫/৪১৭, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ৪/১২২)

প্রসঙ্গ : রোযা, ঈদ, তারাবীহ

মুফতী জহিরুল ইসলাম

বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : কিছুদিন ধরে জনৈক খতীব সাহেবের আলোচনায় মুসল্লিরা দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস ও বিভিন্ন মাসআলায় সন্দিহান হয়ে পড়ছে। তাই বিষয়গুলো সম্পর্কে সমাধান জানালে উপকৃত হব।

১। সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে বাংলাদেশে রোযা রাখা ও ঈদ উদ্‌যাপন করা।

২। তারাবীর নামায একটি দুর্বল সুন্নাত। তারাবীর নামায ২০ রাকআতও পড়া যায় ৮ রাকআতও পড়া যায়।

৩। কওমী মাদরাসার উলামারা যাকাত-ফিতরা খায়। আর যাকাত-ফিতরা হলো গরুর পায়খানার মতো নাপাক বস্তু। এগুলো খাওয়া ও গরুর লেদ খাওয়া সমতুল্য।

৪। আমাদের নিকট কুরআন রয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস রয়েছে, মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই।

আমার জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত মাসআলাগুলো কি সঠিক? যদি মাসআলা সঠিক না হয় তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত ইমামের পেছনে নামায আদায় করা সহীহ কি না। যদি সহীহ না হয় তাহলে যারা এখনো এই ইমামের পেছনে নামায আদায় করছে, তাদের নামাযের কী হুকুম হবে?

সমাধান : ১। সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে রোযা ও ঈদ পালনের কথা কোরআন সুন্নাহর কোথাও নেই বিধায় নতুন উদ্ভাবিত এমতাদর্শ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উপরন্তু এটা এমন কাল্পনিক কথা, যা চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত বাস্তবতার মুখ দেখেনি। (সহীহ মুসলিম ১/৩৪৮, জামেয়ে তিরমিযী ১/১৪৮, আলফিকহুল ইসলামী ২/৬০৮, শারহুননেকায়া ১/৪১২)

২. তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (আবশ্যকীয় সুন্নাত) যা কোনো মুসলমানের জন্য শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া গুনাহ। একে দুর্বল সুন্নাত আখ্যা দেওয়া শরীয়তের সাথে উপহাস ও বেআদবীর শামিল। শরয়ী দলিল প্রমাণাদির ভিত্তিতে তারাবীহর নামায বিশ রাকআত প্রমাণিত। উপরন্তু ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে তারাবীহর নামায বিশ রাকআত আদায় করা হচ্ছে। পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কোথাও এর কম পড়ার ইতিহাস নেই। সাহাবা ও তাবেঈন এবং ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনসহ ইসলামের স্বনামধন্য

সমস্ত ইমামগণ বিশ রাকআত তারাবীহ আদায় করেছেন। তাই সর্বসম্মতিক্রমে তারাবীহর নামায বিশ রাকআত পড়তে হবে। ৮ রাকআত তারাবীহর অস্তিত্ব কুরআন-সুন্নাহর কোথাও নেই। (আলমুসান্নাফ লি-ইবনে আবী শায়বা ৫/২২৬, রাদ্দুল মুহতার ১/৫৯৬, ১/৫৯৯, মাজমাউল আনহুর ১/১৩৫)

৩. মানুষ তার পবিত্র মাল থেকে যে দান-খয়রাত বা যাকাত-ফিতরা আদায় করে তা ফকিরের হাতে পৌঁছার আগে আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে জমা থাকে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

مانقصت صدقة وما مد عبد يده بصدقة الا القيت فى يد الله قبل ان تقع فى يد السائل (شعب الايمان ٣/٢٧٣ حديث رقم ٣٥٢٥ والطبرانى ٤٠٤، حديث رقم ١٢١٥)

অতএব যাকাত-ফিতরাকে গোবরের সাথে তুলনা করা চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। আসহাবে সুফফা তথা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা ইলমে দ্বীন অন্বেষণে সর্বদা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে পড়ে থাকতেন, দান-সদকার মাল দিয়েই তারা নিজেদের জরুরত পুরা করতেন। সূরা বাকারা ২৬৭ ও ২৭২ নং আয়াতের শানে নুযুলে যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাই আসহাবে সুফফার অনুসরণে বর্তমানে কওমী মাদরাসায় বসে বসে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে গিয়ে, যারা মানুষের দান-সদকা গ্রহণ করছে তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ঈমানদারের কাজ হতে পারে না। এ ধরনের গরিব ছাত্রদের জন্য যাকাত-ফিতরার টাকা প্রদান ও সংগ্রহ দ্বীনের বিরাট সহযোগিতা হিসেবে গণ্য হবে। অযথা আলেম-উলামার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। (সূরা বাকারা ২৭৩, তাফসীরে আবু মাসউদ ১/৩১৫, তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৩৯, শরহু ফিকহিল আকবার ২৬০)

৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে যেহেতু কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা মাসায়েল আহরণ করে আমল করা দুঃসাধ্য বিধায় তারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করার জন্য চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাবের শরণাপন্ন হওয়া ওয়াজিব। (জামেউল ফাতাওয়া ২/২৮৫)

মুসলমানদের মাঝে এ ধরনের বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ইমাম বা খতীব হওয়ার যোগ্যতা রাখে না বিধায় মসজিদ কমিটির ঈমানী দায়িত্ব হবে, বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাসের অনুসারী কোনো হক্কানী আলেমকে খতীব নিযুক্ত করা। অন্যথায় বহুক্ষেত্রে মুসল্লিদের নামায নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া ১/৪৩৭, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৩/৩১০)

প্রসঙ্গ : ইমামতী

মুহা: নাজমুল হাসান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

একজন ইমাম সাহেব হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন, শিক্ষকতা করতে গিয়ে মেয়েদেরকে পর্দাহীন ক্লাস করান। জানার বিষয় হলো, তার পেছনে ইক্তিদা করার বিধান কী?

সমাধান :

পর্দা শরীয়তের একটি ফরজ বিধান। এমন অকাট্য বিধান লঙ্ঘনকারী শরীয়তের পরিভাষায় ফাসেক। আর ফাসেকের পেছনে ইক্তিদা করা মাকরুহে তাহরীমি তথা নাজায়েয। তওবা করে বিরত না হলে উক্ত ইমামের পরিবর্তে কোনো নেককার পরহেজগার ইমাম নিয়োগ দেয়া মসজিদ কমিটির ঈমানী দায়িত্ব। (রাদ্দুল মুহতার ১/৫৬০, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩১৯)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা: হাবিবুর রহমান
জালালাবাদ, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

রমাযান মাসে তারাবীহর নামায পড়া অবস্থায় দ্বিতীয় রাক'আতে ইমাম সাহেব ক্বেরাত পড়ে রুকুতে চলে যান। তন্দ্রার কারণে আমি ইমামের সাথে রুকু করতে পারিনি। ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে যান তখন আমি রুকু করি এবং ইমাম সাহেবকে সিজদাতে গিয়ে পাই, জানার বিষয় হলো, নামায পুনরায় পড়তে হবে কি না?

সমাধান :

তন্দ্রার কারণে ইমামের সাথে রুকু করা ছুটে গেলে জাগ্রত হওয়ার পর উক্ত রুকু আদায়করত ইমাম সাহেবকে সিজদায় গিয়ে পাওয়াতে আপনার নামায শুদ্ধ হয়েছে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। (রাদ্দুল মুহতার ১/৫৯৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/৯৩)

প্রসঙ্গ : পালক ছেলে

মুছা: রোজিনা আক্তার
ব্লক-এ, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

২০০৩ সালে শহিদুর রহমান সাহেবের সাথে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু আমাদের কোনো সন্তান না হওয়ায় গত ২০১১ সালে আমার এক দেবরের ৩ মাস ১৮ দিন বয়সী এক ছেলেকে দত্তক নিই। বর্তমানে তার স্কুলে ভর্তির সময় হয়েছে। ওর জন্মদাতা পিতা-মাতা স্বেচ্ছায় পিতা-মাতার নামের জায়গায় আমাদের নাম ব্যবহার করতে বলছে। এখন আমরা শুধু কাগজে-কলমে তার পিতা-মাতার নামের জায়গায় আমাদের নাম ব্যবহার করতে পারব কি না? ওই ছেলের সাথে আমার পর্দার বিধান কিরূপ হবে? ওই ছেলের বয়স যখন ১ বছর সাড়ে তিন মাস তখন আমার এক

বোনের বুকের দুধ ফিডারে করে ওকে খাওয়ানো হয়েছিল। এতে কি আমার বোন ওর দুধ মা হবে? এখানে উল্লেখ্য, ওই ছেলে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন আমার বয়স হবে ৪৪-৪৫ বছর। এমতাবস্থায় আমার বোন যদি ওর দুধ মা না হয়, আমি যদি ওর খালা না হই তাহলে এ বয়সেও কি ওর সাথে আমার পুরোপুরি পর্দা করতে হবে?

সমাধান :

ইসলামী শরীয়তে অন্যের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে দাবি করা এবং অপর লোককে নিজের পিতা বলে প্রকাশ করা হারাম বিধায় কাগজে-কলমে পালক ছেলের জন্মদাতা পিতা-মাতার নামের স্থানে আপনাদের নাম ব্যবহার করতে পারবেন না। (সহীহুল বুখারী ২/৭০৫, মিশকাতুল মাসাবীহ-২৮৭)

দুধ পান করানোর নির্ধারিত সময়ের ভেতর বুকের দুধ ফিডারে নিয়ে পান করালেও রেযা'আত তথা দুধ সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায়। এ হিসেবে আপনার বোন ওর দুধ মা এবং আপনি দুধ খালা গণ্য হবেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে আপন খালার ন্যায় ওর সাথে দেখা করতে পারবেন। (সহীহুল বুখারী ১/৩৬০, আদ্দুররুল মুখতার ১/২১২)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

সভাপতি

দ. আয়নাপুর জামে মসজিদ, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদ ও মাদরাসার জমিটা পাশাপাশি। মসজিদের জমির দক্ষিণ পার্শ্বে অন্য লোকজনের বসতবাড়ি। নামাজের সময় মহিলাদের কণ্ঠস্বর ভেসে এসে নামাজের বিঘ্ন ঘটায়। যার দরুন মসজিদটি একটু উত্তর দিকে সরাতে গিয়ে কিছুটা অংশ মাদরাসার জায়গায় চলে যায়। মসজিদের আয়তন ৩ তলা ফাউন্ডেশন। যার ১ম তলার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাদরাসা এবং মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত আলোচনা সাপেক্ষে মাদরাসার ৩ শতাংশ জমি মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাদরাসার জমিদাতা মসজিদের সভাপতি ও বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো জমি ওয়াকফ করে দেয়ার পর ওয়াকফকারী তা ক্রয় বিক্রয় বা অন্যত্র দান ইত্যাদি কোনো রূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রশ্নেবর্ণিত জমিটি যেহেতু একবার মাদরাসার নামে ওয়াকফ করা হয়েছে, তাই এর কোনো অংশ মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেয়ার অবকাশ নেই। ভুলবশত মাদরাসার যে পরিমাণ জমি মসজিদে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সমমূল্যের ওই পরিমাণ জমি মসজিদের পক্ষ থেকে ক্রয় করে এওয়াজ বদলের মাধ্যমে মাদরাসার নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে। এতে করে ওই অংশটুকুও শরয়ী মসজিদে পরিণত হবে। উল্লেখ্য, বিগত দিনের নামাজ আদায় শুদ্ধ হয়েছে এতে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৫/২০৪, রাদ্দুল মুহতার ৪/৩৮৪)

প্রসঙ্গ : কোয়ান্টাম

মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

জিজ্ঞাসা : কোয়ান্টামের লোকেরা যদি এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। সারা পৃথিবী আমার। যেখানে দরকার সেখানে যাব, যাই প্রয়োজন তাই নেব, যা চাই তা পাব।" তাহলে এতে ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে কি না? বা নিজেকে এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা ইসলাম সমর্থিত কি না?

সমাধান : প্রশ্নেবর্ণিত বিবরণে লোকটি নিজেই নিজের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করে ও দাবি করে সে অহংকারী, অসীম ক্ষমতার দাবিদার এমন আকীদা বিশ্বাস রাখা ঈমানের পরিপন্থী ও ভ্রান্ত আকীদার বিশ্বাসী। কোনো সাহাবা অলিগণ এমনটি করেননি। অথচ তারা আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট ছিলেন। বিধায় এমন কথার দাবিদারকে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। এবং সর্বস্তরের মুসলমানগণ এমন লোকের অনুকরণ-অনুসরণ বর্জন করে হকপন্থী বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ অবলম্বন করা জরুরি। (আদ্দুররুল মনসূর ২/২২৫, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া মাআল হিন্দিয়া ৩/৫৭৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৫/২৯০, মজমুআ ফাতাওয়া ৩৩)

খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া আবরারিয়ার বার্ষিক

এহয়ায়ে সুন্নাত ইজতিমা

২৫,২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ইং ২ ,৩ রবিউল আওয়াল ১৪৩৬ হি.

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থানঃ জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী

বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা।

(শুধুমাত্র উলামায়ে কেরামদের জন্য)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

কামেল কে?

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, কামেল সে ব্যক্তি, যার দৃষ্টি নিজের ত্রুটির ওপর থাকে। এবং এর থেকে শিক্ষা হাসেল করে নিজ কর্মের ওপর লজ্জিত হয়। না হয় এমন কে আছে যে গুনাহ ও ত্রুটিমুক্ত? (আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ-৬৮)

সুন্নাতের গুরুত্বঃ

মাওলানা সৈয়্যদ আসগর হুসাইন দেওবন্দী (রহ.) বলেন, আমি আমার দোস্ত-আহবাবের নিকট এই আরজ পেশ করছি যে, আপনারা রাসূল সা. এর প্রত্যেকটি সুন্নাতের পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করবেন, কোনো সুন্নাতকে তুচ্ছ মনে করবেন না, তা বাহ্যিকভাবে যতইনা ছোট হোক। কেননা রাসূল সা. এর প্রতিটি সুন্নাত আল্লাহ তা'আলার প্রিয়। (প্রাগুক্ত)

আল্লাহর ওলী হওয়ার জামানতঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি তিন বিষয়ের ওপর আমল করতে থাকবে আমি তাকে আল্লাহর ওলী হওয়ার জামানত দিচ্ছি। ১. আল্লাহ ওয়ালাদের সংশ্রব। ২. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা। ৩. সর্বদা আল্লাহর নাফরমানী তথা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (বর্ণনায় ফক্বীহুল মিল্লাত দা.বা.)

জিহবার নিয়ন্ত্রণঃ

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেন, প্রত্যেকের জন্য এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এমন কোনো কথা না বলা যে কথায় অন্যের কষ্ট হয়। (মাজালিছে মুফতিয়ে আজম-৩৮৩)

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তিঃ

হযরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (রহ.) বলেন, কোনো মানুষের অধিকার খর্ব করার দ্বারা যে ক্ষতি হয় তা সারা জীবনের ইবাদতের দ্বারাও পূর্ণ করা সম্ভব নয়। ইসলামের একটি মূলনীতি হলো, আল্লাহর অধিকারের চেয়ে বান্দার অধিকার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর বান্দার এমন প্রিয় যেমন পিতার দৃষ্টিতে সন্তান প্রিয় (বরং এর চেয়েও বেশি)। তাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সে ব্যক্তি সবচাইতে প্রিয়, যে আল্লাহ তা'আলার বান্দার সাথে সদাচরণ করে। (আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ)

কামেল শায়খের পরিচয়ঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, কামেল শায়খের পরিচয় এই যে, তিনি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হবেন। শিরক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকেন। মূর্খের ন্যায় কোন কাজ করেন না। তাঁর সহচার্যে বসলে দুনিয়ার মহব্বত কমতে থাকে এবং আখিরাতের মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর নিকট কোন বাতেনী রোগের বর্ণনা করলে তা মনোযোগ সহকারে শুনে তার প্রতিকার ও চিকিৎসা প্রদান করেন। এবং এতে উপকার হয়। (ইরশাদাতে হযরত থানভী (রহ.)-৭১)

চিন্তামুক্ত জীবনঃ

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, দুনিয়াতে কেউ চিন্তামুক্ত থাকতে চাইলে তার একমাত্র পন্থা হলো কারো থেকে (অর্থাৎ কোন মাখলুক থেকে) কোনো প্রকারের কল্যাণের আশা না রাখা। আশা আকাঙ্খার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর সাথেই রাখা চাই। (আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ-৬৮)

অমূল্য উপদেশঃ

শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (রহ.) এর বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা ক্বারী আমীর হুসাইন (রহ.) বলেন, ইলমের রাস্তা খুবই আশংকাজনক হয়। ওস্তাদ ও কিতাবের আদব খুবই জরুরী। ইলম অর্জনের জন্য একাগ্রতার খুবই প্রয়োজন। তাই সর্বদা একাগ্রচিত্তে ইলম অর্জনে লেগে থাকবে। আল্লামা হুমাইদী (রহ.) বলেন-

لقاء الناس ليس يفيد شيئا
سوى الهذيان من قيل وقال
فاقلل من لقاء الناس الا
لاخذ العلم او اصلاح حال

অর্থাৎ মানুষের সাথে মেলামেশায় কোন ফায়েদা নেই। শুধুমাত্র অহেতুক কথাবার্তা ও আলোচনা-সমালোচনায় এতে সময় অতিবাহিত হয়। তাই মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে মেলামেশা কমিয়ে দাও। তবে ইলম হাসিলের লক্ষ্যে কোন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ অথবা আত্মশুদ্ধীর জন্য নিজ শায়খের সংশ্রব অবশ্যই উপকারী। (কালেমাতে সিদক ও'আদল)

দ্বীনি মাদরাসা জনগণের আমানতঃ

চট্টগ্রাম আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) বলেন, দ্বীনি মাদরাসাসমূহ জনগণের আমানত। মাদরাসার জিম্মাদারদের ওপর 'আতফালে মুসলিমীন' তথা মুসলমানদের ছেলে-পেলে ও 'আমওয়ালে মুসলিমীন' তথা মুসলমানদের দানকৃত মাল ইত্যাদির হেফাযতের দায়িত্ব এসে যায়। যদি কোনো শিক্ষক পূর্বাধ্যয়ন ছাড়া পড়ান এবং এতে কোন স্থানে ভুল পড়ান, তাহলে তা ছাত্রদের হক নষ্ট করা এবং খেয়ানতের শামিল। হাশরের ময়দানে তিনি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। (তাযকিরায়ে আযীয)

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩